মিথ্যা বলার অধিকার ও অন্যান্য

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মিথ্যা বলার
অধিকার
ও অন্যান্য

মিথ্যা বলার অধিকার ও অন্যান্য

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

অনুপম প্রকাশনী

প্রকাশনার তিন দশক

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

©
ড. ইয়াসমীন হক

বর্ণবিন্যাস
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
২০০.০০ টাকা মাত্র

MITHYA BALAR ADHIKAR O ANNANYA (A Collection of Essays)
by Muhammed Zafar Iqbal
Published by Milan Nath, Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar Dhaka-1100

Price : Tk. 200.00 only US$ 5.00.

ISBN 978-984-404-391-6

উৎসর্গ

নূরন্নবী খান এবং খুকু আপাকে

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত
বাংলাদেশে আমাদের অসহায় পরিবারটির
অনিশ্চিত যাত্রায় যাঁরা আমাদের পাশে
থেকে সাহস দিয়েছিলেন

ভূমিকা

আহমদ ছফা বেঁচে থাকলে এখন আমার ওপর খুব রাগ করতেন। আমি মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকায় যে কলাম লিখতাম, সেটা দেখে তিনি খুব বিরক্ত হয়ে বলতেন, "তুমি বিজ্ঞানের মানুষ, তোমার কাজকর্ম হবে বিজ্ঞানীর মতো, লেখালেখি করতে হলে সেটা হবে বিজ্ঞান নিয়ে। তুমি কেন পত্রপত্রিকায় বুদ্ধিজীবী সেজে লেখালেখি করতে যাও?" আহমদ ছফা আমার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন, তাঁর কথা আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনতাম, তাই আমি সত্যি সত্যি পত্রপত্রিকায় লেখালেখি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ করে কিছু একটা ঘটে গেল আর আমি রেগেমেগে আবার পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেছিলাম! একসময় লিখতাম অনিয়মিতভাবে এখন নিয়মিতভাবে লিখতে শুরু করেছি, প্রতি দুই সপ্তাহে একবার। তাই বলছিলাম, আহমদ ছফা বেঁচে থাকলে খুব রাগ করতেন, শুধু যে "বুদ্ধিজীবী" সেজে লিখছি তা নয়—নিয়মিতভাবে লিখছি। এর অবশ্যি একটা কারণ আছে। কারণটা এ রকম :

পৃথিবীর সব দেশে যারা নিয়মিত লেখালেখি করেন, কার্টুন কিংবা কমিক আঁকেন সেগুলো একটা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে একই দিনে অনেকগুলো পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। এটি হচ্ছে একজন লেখক বা শিল্পীর প্রতি একধরনের সম্মান দেখানো। আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাও সেটি করে, কিন্তু সেটি শুধুমাত্র বিদেশি লেখক বা বিদেশি শিল্পীদের জন্যে। সেই সম্মানটুকু কেন আমাদের দেশের লেখক-শিল্পীকে দেওয়া যাবে না, সেটা নিয়ে আমার ভেতরে এক ধরনের ক্ষোভ ছিল—কিন্তু সেই ক্ষোভটা মেটানোর জন্যে আমি কখনো কোনো উদ্যোগ নিইনি।

এরপর বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেল, তখন আমার মনে হলো পত্রপত্রিকাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে একটু চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? আমি চেষ্টা করলাম এবং একধরনের আনন্দ মেশানো বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম অনেকগুলো বড় বড় দৈনিক পত্রিকা এবং ইন্টারনেটভিত্তিক প্রকাশনা আমার প্রস্তাবে রাজি। সেই থেকে এই পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রতি দুই সপ্তাহে একবার করে আমার লেখা ছাপা হচ্ছে; যার অর্থ প্রতি দুই সপ্তাহে আমাকে একবার করে কিছু একটা লিখতেই হবে। কিছু পত্রিকা রাজি হয়নি—তারা বিদেশিদের সিন্ডিকেটেড লেখা ছাপিয়ে বিদেশি লেখক-শিল্পীদের সম্মান

দিতে রাজি কিন্তু নিজ দেশের লেখক-শিল্পীদের সেই সম্মানটুকু দিতে রাজি নয়। আশা করে আছি আমাকে দিয়ে না হোক, আমার দেশের অন্য কোনো লেখক বা অন্য কোনো শিল্পীর লেখা, কার্টুন বা কমিক স্ট্রিপ দিয়ে হলেও তারা একসময় দেশের মানুষকেও সম্মান দেখাতে শুরু করবে।

প্রতি দুই সপ্তাহে একবার করে লেখার জন্যে আমি অনেক বিচিত্র বিষয় ঠিক করে রেখেছিলাম কিন্তু মোটামুটি একই সময়ে নির্বাচন এবং যুদ্ধাপরাধীর বিচার স্থগিত করার জন্যে সারা দেশে একটা ভয়ঙ্কর সহিংসতা শুরু হয়ে গেল। এই সহিংসতার মাঝে যখনই কিছু একটা লেখার জন্যে কলম তুলে নিয়েছি, আবিষ্কার করেছি আমার কলমটি বিষণ্ন। কবে এই বিষণ্ন দিন শেষ হয়ে আবার আমার আনন্দে ঝলমল বাংলাদেশ ফিরে পাব, আমি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। ২০১৩ সালে যে লেখালেখি করা হয়েছে তার মাঝে যেগুলো একটা বইয়ে যুক্ত করা সম্ভব সেগুলো নিয়ে "মিথ্যা বলার অধিকার ও অন্যান্য" প্রকাশিত হলো। লেখাগুলো পড়ে যদি কারো মন খারাপ হয়ে যায় তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা এর চাইতে অনেক বড় দুঃসময় থেকে এর আগে অনেকবার বের হয়ে এসেছি। এবারেও পারব। আবার আমরা আলো ঝলমল-আনন্দময় বাংলাদেশ ফিরে পাব।

০৮.০১.২০১৪ — মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সূচি

১। কেমন করে লেখা হলো ১১
২। অন্য রকম ফেব্রুয়ারি ১৩
৩। প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম ১৫
৪। ... অনেক অনেক অনেক ভালোবাসি ১৭
৫। একাত্তরের দ্বিতীয় পাঠ ২৪
৬। প্রিয় সজল ২৭
৭। আমার পুলিশ অফিসার বাবা ২৯
৮। সাম্প্রতিক ভাবনা ৩৩
৯। আমার বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ ৩৯
১০। গ্লানিমুক্ত বাংলাদেশ ৪৭
১১। গাড়ির চতুর্থ চাকা ৫০
১২। মিথ্যা বলার অধিকার ৫৪
১৩। এই লজ্জা কোথায় রাখি ৫৯
১৪। সাহিত্য ও সাহিত্যিক ৬৩
১৫। আমেরিকা নিয়ে এক ডজন ৬৬
১৬। অস্ট্রেলিয়ায় ঝটিকা সফর ৭৪
১৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ৮০
১৮। সরকারের কাছে অনুরোধ ৮৬
১৯। ভাবনা ও দুর্ভাবনা ৯১
২০। প্রতিবন্ধী নই—মানুষ ৯৬
২১। ডিসেম্বরের প্রথম প্রহর ১০৪
২২। তারুণ্যের দেশ : বাংলাদেশ ১০৯
২৩। গ্লানিমুক্তির বাংলাদেশ ১১৩

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

- রাজু ও আগুনালির ভূত
- বাচ্চা ভয়ংকর কাচ্চা ভয়ংকর
- মেকু কাহিনী
- কাজলের দিনরাত্রি
- নিতু আর তার বন্ধুরা
- গণিত এবং আরো গণিত
- মধ্যরাত্রিতে তিনজন দুর্ভাগা তরুণ
- টুকি এবং ঝা'য়ের (প্রায়) দুঃসাহসিক অভিযান
- বিজ্ঞানী অনীক লুম্বা
- লাবু এলো শহরে
- অক্টোপাসের চোখ
- ভূতসমগ্র
- কিশোর নাটকসমগ্র
- ভয় কিংবা ভালোবাসা

কেমন করে লেখা হলো

"আমার বন্ধু রাশেদ" বইটি যখন লিখি তখন আমি আমেরিকায়, দেশে আসব আসব করছি। দীর্ঘদিন থেকে সেই দেশে পড়ে আছি, প্রায় আঠারো বৎসর, কিন্তু লেখালেখি হয়েছে খুব কম। তার কারণও আছে, আমি একরকম পাণ্ডুলিপি পাঠাই অন্য রকম বই হিসেবে বের হয়ে আসে। একবার একটা বই ছাপা হয়ে এলো। দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম! আমার লেখার পুরো স্টাইল পাল্টে দেয়া হয়েছে। পড়ে মনে হয় আমি লিখিনি অন্য কেউ লিখেছে। দেশে প্রকাশককে ফোন করে কারণ জানতে চাইলাম, তিনি লেখালেখির সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দিয়ে বিশাল একটা চিঠি লিখলেন। অনেক কষ্ট করে পরে আমি অন্য একজন প্রকাশক দিয়ে আমার স্বল্প জ্ঞানের বইটি আমার মতো করে লেখা হিসেবে বের করতে পেরেছিলাম।

এর মাঝে একদিন নিউ ইয়র্কে শহীদ-জননী জাহানারা ইমামের সাথে দেখা হলো। তিনি তখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলন করে আমাদের সবার প্রিয় একজন মানুষ। আমি একদিন খুব কুণ্ঠিতভাবে হুমায়ূন আহমেদের ভাই হিসেবে পরিচিত হতে গেলাম, দেখি তিনি আমার যৎসামান্য লেখা দিয়েই আমাকে আলাদাভাবে চেনেন। শুধু তা-ই না, শহীদ-জননী আমার লেখালেখি নিয়ে খুব দয়ার্দ্র কিছু কথা বললেন। তখন হঠাৎ করে আমার আবার লেখালেখির জন্যে একটা উৎসাহ হলো—এক ধাক্কায় দুই দুইটা বই লিখে ফেললাম, তার একটি হচ্ছে "আমার বন্ধু রাশেদ"।

এটি মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে লেখা একটি কিশোর-উপন্যাস। এটা লেখার সময় আমি চেষ্টা করেছি সেই সময়ের ধারাবাহিকতাটুকু রাখতে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ কিসের ভেতর দিয়ে গিয়েছে সেই ধারণাটাও একটু দিতে চেষ্টা করেছি। এমনিতে আমার কিশোর-উপন্যাসের একটা ফর্মুলা আছে, সব সময়েই সেখানে একটা অ্যাডভেঞ্চার থাকে আর তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আমি আমার ছোট ছোট

পাঠকদের মনে কখনো কোনো কষ্ট দিই না। "আমার বন্ধু রাশেদ" লেখার সময় আমার মনে হলো এই বইটা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা বই, তাই যারা এটি পড়বে তাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ের একটু সত্যিকারের অনুভূতি পাওয়া দরকার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অচিন্তনীয় বীরত্ব আছে, আকাশছোঁয়া বিজয় আছে আর সবচেয়ে বেশি আছে বুকভাঙা স্বজনহারানো কষ্ট। তাই এই বইটাতে আমি খানিকটা কষ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছি, এমনভাবে লিখেছি যেন যারা পড়ে তারা মনে একটু কষ্ট পায়। আমি যেটুকু কষ্ট দিতে চেয়েছিলাম মনে হয় তার থেকে বেশি দেওয়া হয়ে গেছে—সেটি আমি বুঝেছিলাম আমার ছোট মেয়েটির একটি প্রতিক্রিয়া দেখে।

তখন আমি মাত্র দেশে ফিরে এসেছি, ছেলেমেয়ে দুজনেই ছোট, তখনো স্বচ্ছন্দে বাংলা পড়তে পারে না। আমাকে তাই মাঝে মাঝে আমার লেখা বই পড়ে শোনাতে হয়। একদিন আমি তাদের "আমার বন্ধু রাশেদ" পড়ে শোনালাম, পুরোটা শুনে আমার সাত বছরের মেয়েটি কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেল। চুপচাপ বসে থেকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আমরা রাতে ঘুমিয়েছি, সে বিছানায় শুয়ে ঘুমহীন চোখে শুয়ে আছে।

গভীর রাতে সে উত্তেজিত গলায় আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল, বলল, "আব্বু, তুমি একটা জিনিস জানো?" আমি বললাম, "কী?" সে আমাকে বলল "বইয়ে লেখা আছে রাশেদকে গুলি করে মেরেছে। কিন্তু তার লাশ তো পাওয়া যায়নি!" আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না সে কী বলতে চাইছে, কিন্তু তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, "না, লাশ পাওয়া যায়নি।" আমার সাত বছরের মেয়ের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল, বলল, "তার মানে বুঝেছ? আসলে রাশেদের গুলি লাগেনি। সে মারা যায়নি। পানিতে পড়ে সাঁতার দিয়ে চলে গেছে।" আমি অবাক হয়ে আমার ছোট মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, বললাম, "হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ। রাশেদের শরীরে গুলি লাগেনি—সে মারা যায়নি। সাঁতরে সে চলে গেছে। সে বেঁচে আছে।"

আমার মেয়ের বুকের ভার নেমে গেল, তার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল, গভীর একটা প্রশান্তি নিয়ে সাথে সাথে সে ঘুমিয়ে গেল।

আমার ছোট মেয়েটির মতো আরো কত শিশুকে না জানি আমি কত কষ্ট দিয়েছি! সম্ভব হলে সবাইকে বলে আসতাম যে রাশেদ মারা যায়নি। রাশেদরা আসলে কখনো মারা যায় না।

অন্য রকম ফেব্রুয়ারি

এই ফেব্রুয়ারিটা অন্য রকম। প্রতি বছর আমি ফেব্রুয়ারি মাসটার জন্যে আলাদাভাবে অপেক্ষা করি। সারা বছর লেখালেখি করার সময় পাই না, তাই ক্যালেন্ডারে যখন দেখতে পাই ফেব্রুয়ারি মাস আসি আসি করছে তখন আমি নাক-মুখ গুঁজে লিখতে বসি। ফেব্রুয়ারি মাস আসতে আসতে লেখালেখি শেষ করে বইমেলার জন্যে অপেক্ষা করি। যদি ঢাকা শহরে থাকতাম তাহলে নিশ্চয়ই প্রতিদিন বইমেলায় হাজির হতাম, কিন্তু সেটি আমার ভাগ্যে নেই। ছুটি-ছাঁটায় যাই, বই দেখি, বইপাগল মানুষ দেখি, ভারি ভালো লাগে।

একটি একটি করে দিন কাটে, আমি তখন একুশে ফেব্রুয়ারির জন্যে অপেক্ষা করি। একুশে ফেব্রুয়ারি—কী অসাধারণ একটি দিন! একসময় সেটা ছিল শোকের দিন, এখন সেটা শুধু শোকের দিন নয়, সেটা ভালোবাসার দিন। মাতৃভূমির জন্যে ভালোবাসা, মাতৃভাষার জন্যে ভালোবাসা। এই ভালোবাসা এখন শুধু আমাদের জন্যে নয়, এখন সেটা সারা পৃথিবীর সকল মানুষের মাতৃভাষার জন্যে ভালোবাসা।

এই দিনটিতে সম্ভব হলে আমি ঢাকা চলে আসি। ভোরবেলা আমি শহীদ মিনারের পাশে মানুষের যে ঢল নামে সেই ঢলের পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। গভীর রাত থেকে শত শত নয়—হাজার হাজার মানুষ এসে ভিড় করে, যত মানুষ আমার তত আনন্দ। আমি যতটুকু শহীদ মিনার দেখতে যাই তার চাইতে বেশি যাই মানুষ দেখতে। বাবা শিশুপুত্রটিকে ঘাড়ে নিয়ে এসেছে, কিশোরী মেয়েটি এসেছে মায়ের হাত ধরে। তরুণীটি এসেছে তার ভালোবাসার তরুণের সাথে। সবার হাতে ফুল, গালে বাংলা বর্ণমালা, কী অপূর্ব একটি দৃশ্য! একটু একটু করে মানুষগুলো এগিয়ে যায় আর আমি তাদের পেছনে পেছনে হাঁটি। মানুষের ভিড়ে অনেক সময় শহীদ মিনারের কাছে যেতে পারি না। তখন কোনো একজন তেজি তরুণের হাতে ফুলগুলো দিয়ে বলি, আমার হয়ে ফুলগুলো শহীদ মিনারে দিয়ে দিও। তারা ঘাড় নেড়ে রাজি হয়।

আমি তখন মানুষের মুখ দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়াই। একটি দেশ তো শুধু দেশের মাটি নয়, দেশ হচ্ছে দেশের মানুষ। একুশে ফেব্রুয়ারিতে সেই দেশের মানুষ দেশের জন্যে ভালোবাসা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। আমি সেই মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে নিজের ভেতরে এক ধরনের শক্তি অনুভব করি। নূতন এক ধরনের আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। আমি বুঝতে পারি এই দেশে কখনো কোনো অন্ধকার শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো আলাদা করে কিছু করে না, তারপরেও আমি অবাক হয়ে দেখি তাদের ভেতরে কী এক আশ্চর্য শক্তি লুকিয়ে থাকে। সেই শক্তির ভেতরে থেকে আমি নিজের ভেতরে শক্তি খুঁজে পাই। সে জন্যে প্রতি বছর আমি আলাদাভাবে ফেব্রুয়ারি মাসের জন্যে অপেক্ষা করি।

এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসটা অন্য রকম। এই বছর আমার শুধু একটি একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে না। আমি যে জন্যে একুশে ফেব্রুয়ারির জন্যে অপেক্ষা করি এই বছর প্রতিটি দিনই সে রকম। প্রতিদিন চারপাশে ঘর থেকে বের হওয়া মানুষ। কেউ যখন দেশকে ভালোবেসে ঘর থেকে বের হয় সেই মানুষগুলো হয় অন্য রকম। প্রথমে ছিল কমবয়সী তরুণ-তরুণী, তারপর এসেছে বৃদ্ধ-যুবা। এসেছে শিশু-কিশোর। তারা ঘুরে-ফিরে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে আমরা বাঙালি। তারা ঘোষণা দিয়েছে, যারা এই দেশ চায়নি তাদের এ দেশে স্থান নেই। পৃথিবীর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে যারা অংশ নিয়েছে, তাদেরকে তারা শুধু বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায় না, বিচার করে শাস্তি দিয়ে দেশকে কলঙ্কমুক্ত করতে চায়। তারুণ্যের এত বড় জোয়ার কী আগে কখনো দেখেছে এ দেশের মানুষ? দেখেছে পৃথিবীর মানুষ?

সে জন্যে এই ফেব্রুয়ারিটা অন্য রকম। এই দেশের তরুণেরা আমাদের বাহান্ন দিয়েছিল, ঊনসত্তর দিয়েছিল। বুকের রক্ত দিয়ে একাত্তর দিয়েছিল। এখন তারা ২০১৩ দেবে?

আমরা অপেক্ষা করে আছি।

লেখার তারিখ : ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০১৩

[দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত]

প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম

প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলামের মৃত্যু-সংবাদটির জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না, বেশ কিছুদিন থেকেই সেই খবরটা পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে জন্যে তাঁকে যে এভাবে চলে যেতে হবে সেটা একবারও মাথায় আসেনি। মৃত্যু-সংবাদটি পাওয়ার সাথে সাথে আমার প্রথম যে অনুভূতিটি হয়েছে সেটি হচ্ছে একজন অভিভাবককে হারানো—যিনি মাথার ওপর থেকে এত দিন আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, নিরাপত্তা দিয়েছেন।

সেই আমেরিকা থাকার সময় আমি যখন দেশে আসব আসব করছি তখন আমার একজন বিজ্ঞানী বন্ধু দেশ থেকে ঘুরে এসে বলল, প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করেছেন। তার নাম রিসার্চ সেন্টার ফর ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স। তিনি সেখানে গবেষণার চমৎকার একটা পরিবেশ তৈরি করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ক্যামব্রিজের এত উন্নত একটা পরিবেশ ছেড়ে দেশে গিয়ে তাঁর কোনো সমস্যা হচ্ছে না? দেশে থাকতে পারছেন? আমার বন্ধুটি জানাল, প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলামের কোনো সমস্যা হচ্ছে না, তিনি বলেছেন কেউ যদি দেশে প্রথম পাঁচটি বছর কাটিয়ে দিতে পারে তাহলে পাকাপাকিভাবে থাকতে কোনো সমস্যা হয় না।

আমি সেই কথাটি মনে রেখেছিলাম, দেশে ফিরে এসে ছোটখাটো ধাক্কা যে খাইনি তা নয়—কিন্তু সব সময় প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলামের কথাটির ওপর ভরসা করে থেকেছি। সত্যি সত্যি প্রথম পাঁচ বছরের পর কখনোই কোনো সমস্যাকে আর সমস্যা মনে হয়নি। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ নিজ দেশে ফিরে এসে যে থাকা সম্ভব সেই আত্মবিশ্বাসটুকু দেওয়ার জন্যে।

প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম একজন আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানী ছিলেন। পৃথিবীর সেরা সেরা বিজ্ঞানীদের সাথে তাঁর আন্তরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর গবেষণাকেন্দ্রে অনেকে এসেছেন, এখান থেকে অনেক বিজ্ঞানী-গবেষক বের হয়েছেন।

এই দেশে যে মৌলিক গবেষণা করা সম্ভব তিনি সেটা প্রমাণ করেছেন। তাঁর অবদানের জন্যে রাষ্ট্র তাঁকে একুশে পদক দিয়ে সম্মানিত করেছে।

বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চা আর গবেষণায় তিনি আমাদের সবার একধরনের আশ্রয় ছিলেন। ছোট-বড় যে-কোনো সেমিনার বা কনফারেন্সে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি চলে আসতেন—তাঁর সাথে সব সময় থাকতেন তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী সুরাইয়া ইসলাম। কনফারেন্সের শেষে বিজ্ঞানী-গবেষকরা যখন কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দ অনুষ্ঠানে মেতে উঠতেন তখন অবধারিতভাবে জামাল নজরুল ইসলামকে স্টেজে উঠতে হতো আমাদের গান শোনানোর জন্যে। খুব সুন্দর গাইতে পারতেন। শুনেছি অনেক রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন, যদিও সেগুলো শোনার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি।

অনেক ভাষা জানতেন প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম, যাঁরা তাঁর কাছাকাছি থাকতেন তাঁদের কাছে শুনেছি, প্রথম যখন দেশে আসেন তখন তাঁর বাংলা চর্চাটাই নাকি ছিল কম। কিন্তু দেশে থেকে মাতৃভাষার চর্চা করতে করতে ভাষাটাকে খুব আপন করে নিয়েছিলেন, খুব সুন্দর লিখতে পারতেন, বিজ্ঞানচর্চা এবং দেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বাংলায় লেখা দুটি বই তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

একাত্তরে তিনি দেশের সপক্ষে জনমত তৈরি করার জন্যে অনেক লেখালেখি করেছিলেন। এই অভ্যাসটুকু তাঁর সারা জীবনই ছিল, যখনই কোনো কিছু তাঁকে বিচলিত করত তিনি তাঁর প্রতিকারের জন্যে চিঠি লিখতেন। আর্থিকভাবে খুব সচ্ছল ছিলেন সে রকম প্রমাণ নেই কিন্তু পাহাড় ধসে মানুষ মারা গেছে জানতে পেরে তাঁর সব টাকা অসহায় পরিবারকে দিয়ে এসেছেন এরকম ঘটনা ঘটেছে তার অনেক প্রমাণ আছে!

এত বড় বিজ্ঞানী এবং গবেষক কিন্তু কোনো একটি বিচিত্র কারণে বিজ্ঞানচর্চার জন্যে কম্পিউটার দূরে থাকুক ক্যালকুলেটর পর্যন্ত ব্যবহার করতেন না! সেটা নিয়ে তাঁর সাথে তর্ক করার কোনো সুযোগ ছিল না—শুধু কাগজ-কলম ব্যবহার করে যিনি এত চমৎকার গবেষণা করেছেন, জগদ্বিখ্যাত বই লিখেছেন, তাকে অন্য কিছু বোঝানোর জন্যে কোন যুক্তি ব্যবহার করব?

দেশ নিয়ে খুব ভাবতেন, বিদেশি সাহায্য না নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারটি তিনি খুব কঠিনভাবে বিশ্বাস করতেন। আমার ধারণা বিজ্ঞানী হয়েও তাঁর মতো অর্থনীতি জানত সে রকম মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।

আমার এখনো বিশ্বাস হয় না তিনি নেই—এই দেশে বিজ্ঞানের কনফারেন্স হবে আর তিনি চমৎকার পোশাক পরে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন না, আমাদের সাথে দেখা হলে অসম্ভব মধুর একটা হাসি দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলবেন না—সেটা মেনে নিতে আমাদের সবারই খুব কষ্ট হবে।

লেখার তারিখ : মার্চ ২০, ২০১৩

[দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত]

...অনেক অনেক অনেক ভালোবাসি

ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখ আমি শাহবাগের মঞ্চে ছিলাম—আহামরি কোনো মঞ্চ নয়, একটি খোলা ট্রাক কিন্তু সেটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে অভূতপূর্ব ঘটনাগুলোর একটি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই মানুষ—আমি এর আগে কখনো কোনো মঞ্চ থেকে একসাথে এত মানুষ দেখিনি। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়টি ছিল আমার বুকের ভেতরের অনুভূতি, যে এই মানুষগুলো বয়সে তরুণ, এরা সবাই আমার আপনজন, সারা জীবন আমি যে স্বপ্ন দেখে এসেছি, এই তরুণরা সবাই সেই স্বপ্ন দেখে।

সেই মঞ্চে মাথায় হলুদ ফিতে বাঁধা ব্লগাররা ছিল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর আমার কোনো ভাষা ছিল না তাই একজন একজন করে তাদের সবাইকে আমি বুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। (এদের ভেতর নিশ্চয়ই রাজীবও ছিল, আমি তখন জানতাম না এক সপ্তাহের মাঝে নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হবে।) মঞ্চে দাঁড়িয়ে অগণিত তরুণ-তরুণীর দিকে তাকিয়ে আমি আমার বুকের ভেতর একধরনের শক্তি অনুভব করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, সারা জীবন আমি বুভুক্ষের মতো যে জিনিসটির জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম, তার সবটুকু এখানে পেয়ে গেছি। যে স্বপ্নটি দেখতে পর্যন্ত দ্বিধা করতাম তার থেকে শতগুণ বেশি কেউ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।

আমি একটি প্রজন্ম চেয়েছিলাম, যারা এই দেশটিকে ভালোবাসবে। দেশটি যখন তার সব দুঃখ-কষ্ট পেছনে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াবে শুধু তখন তাকে ভালোবাসবে তা নয়। দেশটি যখন দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হবে তখনো ভালোবাসবে, অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি-দারিদ্র্যে যখন ক্ষত-বিক্ষত হবে তখনো গভীর মমতায় দেশটিকে বুকে আগলে রাখবে। আমি স্বপ্ন দেখতাম সেই ভালোবাসাটুকু আসবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে। নূতন প্রজন্ম শুধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আর তথ্যের মাঝে নিজেদের আটকে রাখবে না, সেটি শুধু দিন, তারিখ, নাম আর পরিসংখ্যান হবে না, তারা মুক্তিযুদ্ধকে বুকের মাঝে

ধারণ করবে। আমি ভেবেছিলাম আমার এই স্বপ্ন আসলে কখনো পূরণ হওয়ার নয়। সারা পৃথিবীর সকল তথ্য এখন সবার হাতের মুঠোয়, বাইরের জগতের উচ্ছল-উদ্দাম তারুণ্যের ছবি নিশ্চয়ই আমাদের তরুণদের মোহগ্রস্ত করে রাখবে। আমি ভেবেছিলাম একাত্তর তাদের কাছে হবে বড়জোর ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমাদের প্রজন্ম যে তীব্র আবেগ নিয়ে একাত্তরকে বুকে ধারণ করে নূতন প্রজন্ম কখনো সেটি করবে না, করার কথা নয়।

কিন্তু আমি অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি, এই নূতন প্রজন্ম গভীর ভালোবাসায় একাত্তরকে বুকের গভীরে স্থান দিয়েছে। তারা একাত্তর দেখেনি, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব কিংবা আত্মত্যাগও দেখেনি। হাতে সঠিক অস্ত্র নেই, গায়ে কাপড় নেই, পেটে খাবার নেই, তারপরও রাইফেলের কালো নলে চিবুক স্পর্শ করে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রিগারে আঙুল দিয়ে শতগুণ শক্তিশালী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দিকে অস্ত্র তাক করে থাকতে দেখেনি। গ্রেনেডের পিন খুলে গাছের ডালে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে সাহসী তরুণদের মিলিটারি কনভয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখেনি। রাজাকারদের হাতে ধরা পড়া গাছের সাথে বেঁধে রাখা অত্যাচারে জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেনি। জল্লাদখানায় পাকিস্তানি মিলিটারিদের একটি একটি করে নখ উপড়ে নিতে দেখেনি। ঘরের ভেতর যখন পাকিস্তান মিলিটারি স্ত্রীকে ধর্ষণ করছে তখন বাইরে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকা স্বামীকে দেখেনি। ক্যাম্পের ভেতর ধরে নেওয়া তরুণীকে দেখেনি, রাস্তায় উবু হয়ে বসে থাকা তার ব্যাকুল বাবাকে দেখেনি, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অমিত তেজের কিশোরকে জয় বাংলা স্লোগান দিতে দেখেনি। তারপরও এই তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করতে পেরেছে। একটা জাতির জন্যে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? সৃষ্টিকর্তার কাছে আমার আর কিছু চাইবার নেই।

২.

আমাদের এই নূতন প্রজন্ম শুধু যে মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশকে ভালোবাসে তা নয়, তারা অনেক আধুনিক এবং তারা অনেক লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে। তারা কোনো ধরনের প্রযুক্তিকে ভয় পায় না এবং বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। তাদের ভেতর আবেগ আছে এবং সেটা প্রকাশ করতে তাদের দ্বিধা নেই, কিন্তু যখন সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন তারা আবেগটা সরিয়ে রেখে যুক্তি-তর্ক দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সৎ, আত্মবিশ্বাসী এবং তাদের অসাধারণ কমনসেন্স। হঠাৎ করে তারা রাতারাতি গড়ে ওঠেনি, তারা নিশ্চয়ই অনেক দিন থেকেই নিজেদের মতো করে গড়ে উঠছিল, আমাদের মতো মানুষের চোখে পড়েছে হঠাৎ করেই। মনে আছে যুদ্ধাপরাধীর বিচার বন্ধ করার জন্যে জামায়াত-শিবির অনেক দিন থেকেই পুলিশদের সাথে পথে-ঘাটে মারামারি করছে, তার মাঝে হঠাৎ একদিন দেখা গেল মতিঝিলে তাদের সাথে পুলিশের একধরনের ভালোবাসার সম্পর্ক হয়ে গেছে। জামায়াত-শিবির রীতিমতো ফুল

দিয়ে পুলিশকে বরণ করে নিচ্ছে। দেশের মানুষ তখনই ভুরু কুঁচকে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করতে শুরু করে। মতিঝিলের সেই সভায় জামায়াত প্রথম সদম্ভে দেশে গৃহযুদ্ধের একটা হুমকি দিল, নিজের কানে শুনেও সেটা বিশ্বাস হয় না। যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা ৩৪৪ জন মানুষ হত্যায় দোষী সাব্যস্ত হয়েও সর্বোচ্চ শাস্তি না পাওয়ার ঘোষণাটি ছিল হতাশার, সেই হতাশাটি অবিশ্বাস্য ক্ষোভে পরিণত হলো যখন দেখা গেল শাস্তির রায় শুনে বিজয়ের ঘোষণা দেওয়ার জন্যে কাদের মোল্লার হাতে ভি সাইন উঠে এসেছে। এত দিন থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্যে এত প্রস্তুতি, এত অপেক্ষা, সেই বিচারের রায় শুনে যুদ্ধাপরাধীরা যদি নিজেদের বিজয়ী ঘোষণা করতে শুরু করে তাহলে দেশের মানুষ তো বিচারের পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ে বিভ্রান্ত হতেই পারে। সঠিক রায় দেওয়ার জন্যে দেশকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন মনে করতেই পারে।

আমাদের নূতন প্রজন্ম এই দুঃসময়ে পথে নেমে এসেছিল। বিষয়টি ছিল পুরোপুরি স্বতঃস্ফূর্ত, কোথায় কী হচ্ছে না জেনেও দেশের অনেক জায়গার মতো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছেলেমেয়ে প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। এর পরের ঘটনা আমরা সবাই জানি, শাহবাগের বিক্ষোভ সমাবেশটি দেখতে দেখতে শান্তিপূর্ণ এবং পুরোপুরি অহিংস কিন্তু প্রবলভাবে তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর একটি গণজাগরণের রূপ নিয়ে নিল। কত দিন এই আন্দোলন চলবে, কে নেতৃত্ব দেবে, আন্দোলনটি কেমন করে শেষ হবে—এসব বিষয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না, এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু আমার ধারণা, দেশের ক্রান্তিকালে যে এত দিন চোখের আড়ালে থাকা দেশের তরুণেরা নেতৃত্ব দিতে পারে, সাধারণ মানুষেরা এত দিনে সেটা মেনে নিয়েছে।

৩.

গণজাগরণ মঞ্চের এই নূতন কালচারটা শুরু হওয়ার পর সময় পেলেই আমি সেখানে গিয়ে বসে থাকি—সেটা ঢাকাতেই হোক আর সিলেটেই হোক। পুরো ব্যাপারটা তরুণদের, তার মাঝে মাথায় পাকা চুল নিয়ে আমার সেখানে হাজির হতে খানিকটা যে সংকোচ হয় না তা নয়, তাই সব সময়েই চোখের কোনা দিয়ে খুঁজতে থাকি আমার বয়সী আর কেউ আছে কি না। খোঁজাখুঁজি করলে পাওয়া যায়, অনেকেই থাকেন—এদের মাঝে মুক্তিযোদ্ধারা আছেন, শহীদ পরিবারের লোকজন আছেন, আমার মতো অতি-উৎসাহীরা আছেন, বয়স্কা মহিলারাও থাকেন। আমি বেশ অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি, এরকম একটি সমাবেশে আমি দীর্ঘ সময় বসে থাকতে পারি এবং আমি এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করি। এখানে গান হয়, বক্তৃতা হয়, স্মৃতিচারণা হয় এবং সবচেয়ে বেশি যেটা হয় সেটা হচ্ছে স্লোগান! আমাদের দেশের তরুণদের মতো স্লোগান পৃথিবীর আর কোথাও দেওয়া হয় কি না এবং দেওয়া হলেও সেটা এ রকম প্রাণবন্ত হয় কি না সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিছু কিছু স্লোগান যে আমার মতো মানুষের জন্যে যথেষ্ট বিব্রতকর নয় তা নয়—কিন্তু বেশিরভাগ স্লোগানই

এককথায় অপূর্ব। সেগুলোর শব্দ-চয়ন, বাক্য-গঠন, রসবোধ এবং ছন্দের কোনো তুলনা নেই। আমি এই ধরনের সমাবেশে বসে শুধু যে স্লোগানের বক্তব্য শুনি তা নয়, স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিটাও প্রবলভাবে উপভোগ করি। পুরোপুরি গলা ভেঙে গেছে, গলা থেকে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না, তার পরেও একজন পুরো শরীর কাঁপিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্লোগান ধরছে এবং অন্যেরা তার মুখ দেখে স্লোগানটি বুঝে পাল্টা প্রতি-স্লোগান দিচ্ছে—এ রকম বিচিত্র দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যাবে বলে মনে হয় না। বোরকা কিংবা হিজাব পরা যে মেয়েটিকে এত দিন লাজুক কিংবা শান্ত জেনে এসেছি তার কণ্ঠ থেকে বজ্রনিনাদ শুনে বুঝতে পেরেছি, এত রক্তে অর্জন করা দেশটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটুকু নিয়ে তার বুকে কী গভীর একটা ক্ষোভ এত দিন লুকিয়ে ছিল।

নূতন প্রজন্মের এই স্লোগানগুলোর ভেতর দিয়ে দেশের জন্যে গভীর ভালোবাসা, মুক্তিযুদ্ধের জন্যে তীব্র আবেগ আর যুদ্ধাপরাধীদের জন্যে ভয়ংকর ঘৃণা ফুটে ওঠে কিন্তু তার সাথে সাথে এই নূতন প্রজন্মের দেশ নিয়ে নিজস্ব স্বপ্নটুকুও আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। তারা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ চায়, ছেলেমেয়েরা সমান অধিকার চায়, ধনী-গরিবের বিভাজন দূর করতে চায়। একাত্তরে যেটি ঘটেছিল, এখানেও ভিন্ন মাত্রার সেটি ঘটতে শুরু করছে, সবার ভেতর ভালো হওয়ার চেষ্টা, অন্যের জন্যে মমতা, সহনশীলতা, শ্রদ্ধাবোধ একটি বিস্ময়কর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। (স্কুটারওয়ালার কাছে ভাংতি টাকা নেই বলে তাকে একজন মোবাইল টেলিফোন নম্বর দিয়ে চলে এসেছে, স্কুটারওয়ালা সেই নম্বরে টাকা ফ্লেক্সিলোড করে দিয়েছে।) আমি লক্ষ করেছি এই সমাবেশগুলোতে কোনো ইভ টিজিং নেই—যে মেয়েরো ব্যান্ড শুনতে যেতে ভয় পায়, তারা বিন্দুমাত্র শঙ্কা ছাড়া এখানে বসে থেকে স্লোগান দেয়! এই সব কিছুর সাথে সাথে আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে জয় বাংলা স্লোগানের প্রত্যাবর্তন। মুক্তিযুদ্ধের এই স্লোগানটি কোনো দলের স্লোগান ছিল না, কিন্তু এত দিন সেটিকে দলের স্লোগান হিসেবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ বছর পর এটা আবার সকল মানুষের স্লোগান হয়ে ফিরে এসেছে। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্মের মানুষ তাদের জন্যে এটি যে কত বড় উপহার সেটি কোনো দিন কাউকে বোঝাতে পারব না।

৪.

আমি যখন এ লেখাটি লিখছি তখন সারা দেশে এক ধরনের তাণ্ডব চলছে, ভয়াবহতার ধাক্কাটা একটু কমেছে কিন্তু শেষ হয়নি। আমার একজন ছাত্র (সম্ভবত হিন্দু ধর্মাবলম্বী) যখন প্রথম শুকনো মুখে বেশ কিছুদিন আগে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, দেশে কী এখন হিন্দু-মুসলমান "রায়ট" শুরু হয়ে যাবে, তখন তার কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এখানে হিন্দু আর মুসলমানদের মাঝে কিছু নেই, শুধু শুধু তাদের মাঝে দাঙ্গা হবে কেন? বোঝাই যাচ্ছে আমি জামায়াত-শিবিরের কাজের ধরন সম্পর্কে কিছুই জানি না, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করার দাবিতে তারা হিন্দু

ধর্মাবলম্বীদের ওপর আক্রমণ শুরু করে দিল। গোলমালকে জিইয়ে রাখার অনেক পুরনো পদ্ধতি, আশপাশের মুসলমানদের ধারণা দেওয়া হয়, তোমাদের কোনো ভয় নেই, আমরা বেছে বেছে শুধু হিন্দুদের ধ্বংস করব। একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যা যা করেছিল, এত দিন পর আবার হুবহু সেই কাজগুলো করা হচ্ছে। হিন্দুদের ঘরবাড়ি, মন্দির-উপাসনালয় পুড়িয়ে দেওয়া তো আছেই, তার সাথে আছে আওয়ামী লীগ কিংবা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষজনকে হত্যা করা, শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য ধ্বংস করা, জাতীয় পতাকার অবমাননা করা। শুধু তা-ই নয়, এই কাজগুলো করার জন্যে যখন প্রয়োজন ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে (অবলীলায় একজনকে নাস্তিক-মুরতাদ বলা হচ্ছে) কিংবা মিথ্যাচার করা হচ্ছে—চাঁদে যুদ্ধাপরাধীর চেহারা দেখা যাচ্ছে বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। হরতাল হচ্ছে, বিদ্যুৎকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, অফিস-আদালত পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, পদ্মা ব্রিজ নিয়ে এ দেশে এত হৈচৈ অথচ খবরের কাগজে দেখছি যত সম্পদ নষ্ট হয়েছে সেটা দিয়ে একটা পদ্মা ব্রিজ তৈরি হয়ে যেত। একজন মানুষের প্রাণ পদ্মা ব্রিজ থেকে অনেক বেশি, সেই মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। প্রাণটি একজন পুলিশ, নিরীহ পথচারী, রাজনৈতিক কর্মী কিংবা জামায়াত-শিবিরের সমর্থক হোক না কেন প্রত্যেকবারই সেটি সমান বেদনাদায়ক। পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের মৃত্যুই আপনজনেরা মেনে নিতে পারে না, আর এ রকম মৃত্যুগুলো মেনে নেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। সারা দেশ নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে কখন এই তাণ্ডব বন্ধ হবে, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতির চাইতে খারাপ আর কী হতে পারে? আগে দেশে একটি অলিখিত আইন ছিল, ছোট ছেলেমেয়েদের বড় পরীক্ষাগুলোতে হরতাল দেওয়া হবে না, এবারে সেই আইনটিকে যে শুধু অমান্য করা হলো তা নয়, মনে হলো এখন থেকে সেটাই বুঝি নিয়ম, এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষা বন্ধ করে লেখাপড়ার সর্বনাশ করাতেই বুঝি গৌরব।

বাংলাদেশের মানুষ এর চাইতেও অনেক খারাপ অবস্থা থেকে বের হয়ে এসেছে। আমরা জানি এবারেও এই অস্থিরতা থেকে বের হয়ে আসবে। সে জন্যে কত দিন অপেক্ষা করতে হবে, আমাদের কতখানি ধৈর্য ধরতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা, কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সেটা আমরা জানি না।

শুধু একটা বিষয় জানি, এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এই দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রক্ষা করা। উনিশ শ' একাত্তরে আমি দেখেছি একজন হিন্দু মা তাঁর শিশুসন্তানকে বুকে চেপে ধরে উদ্ভ্রান্তের মতো তাঁর স্বামীর হাত ধরে ছুটে যাচ্ছেন, এত দিন পর এই দেশে আবার এই ঘটনা ঘটবে আর আমরা সেটা শুধু তাকিয়ে দেখব? আমি নিজেকে একটা হিন্দু পরিবারের ছোট একটি শিশু হিসেবে কল্পনা করে দেখেছি তাদের মূল অনুভূতিটি হচ্ছে অবর্ণনীয় আতঙ্কের, অসহায় বোধ এবং তীব্র হতাশার। সবচেয়ে বড় অনুভূতিটি হচ্ছে এই দেশের ওপর, দেশের মানুষের ওপর রাগ, দুঃখ বা ক্ষোভ নয় একটি গভীর অভিমানের। একটা দেশ বা দেশের মানুষের জন্যে এর চাইতে বড় লজ্জা আর কী হতে পারে?

৫.
গণজাগরণ মঞ্চ থেকে এই দেশের তরুণরা একটা আন্দোলন শুরু করেছে। এই আন্দোলনটি কীভাবে শেষ হবে, এর সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা কীভাবে ঠিক করা হবে সেসব নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা অনেক সময় এই তরুণদের নিয়ে দুর্ভাবনা করেন, তাদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা করেন, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন।

কী কারণ জানা নেই, আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আমার যেটুকু পাওয়ার ছিল আমি সেটা পেয়ে গেছি। আমি সব সময়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম, এই দেশে একটি তরুণ প্রজন্ম হবে, যারা মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করবে আর মুক্তিযুদ্ধে পাওয়া এই দেশটিকে ভালোবাসবে—আমার সেই স্বপ্ন এর মাঝে সফল হয়েছে, আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

কেউ যদি আঙুলে গুনে গুনে প্রাপ্তি হিসেব করতে চায় সেটিও কি কম? কেউ কি ভেবেছিল, দুই সপ্তাহের ভেতরে আইন পাল্টে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ তৈরি হবে? শুধু আলাদা আলাদা মানুষ নয়, রাজনৈতিক দলটিরও বিচার করা সম্ভব হবে? এই দেশে জামায়াত-শিবির একটি আতঙ্কের আবহ তৈরি করে রেখেছিল এখন কি এই দেশে ছোট একটা শিশুও অবলীলায় তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় না? গণজাগরণ সভায় ককটেল ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পুরো সভাকে কি ভণ্ডুল করা গেছে? বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কি তরুণ-তরুণীরা শান্তভাবে বসে থাকেনি? তাদের মনোবল শতগুণ বেড়ে যায়নি? জামায়াতে ইসলামীর বড় শক্তি হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক শক্তি—ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হাসপাতাল, কোচিং সেন্টার, পরিবহন, দোকানপাট, কী নেই তাদের? গণজাগরণ মঞ্চের এই আন্দোলন কি এই পুরো অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়নি? পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের কি এখন সাফাই গাইতে হচ্ছে না? আমাদের দেশের অর্ধেক হচ্ছে মেয়ে, আমরা জীবনের সব জায়গায় ছেলেমেয়েদের সমানভাবে দেখি না। এই আন্দোলনে ছেলেরা আর মেয়েরা কি সমানভাবে পথে নেমে আসেনি?

এই তালিকা আরো অনেক লম্বা করা সম্ভব, আমি তার চেষ্টা করছি না, কারণ আমার হিসেবে দেশের তরুণদের মূল অর্জনের তুলনায় এসব ছোটখাটো অর্জন। তাদের মূল অর্জন হচ্ছে এই দেশের তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে বুকের গভীরে নিয়ে যাওয়া। এই প্রজন্ম এই মুহূর্তে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবিতে পথে নেমেছে—কেউ কী ভাবছে যুদ্ধাপরাধীর বিচার শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা উদ্দেশ্যবিহীন হতোদ্যম কিছু তরুণ-তরুণীতে পাল্টে যাবে? মোটেও না–আমি লিখে দিতে পারি তখন তারা অন্য কোনো আন্দোলনে পথে নামবে–হয়তো দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, হয়তো গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন, অশিক্ষা-কুশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা দূর করার আন্দোলন, নারী-পুরুষের সমান অধিকারের আন্দোলন।

সব আন্দোলনই পথে বসে স্লোগান দিয়ে হয় না; অনেক আন্দোলন হবে লেখালেখি করে, গবেষণা করে, গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে। অবসর সময়ে এই তরুণেরা হয়তো প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে স্কুলে পড়াবে, তরুণ ডাক্তারেরা বস্তিতে বাচ্চাদের চিকিৎসা করবে। তরুণ কবিরা কবিতা লিখবে, নাট্যকাররা নাটক তৈরি করবে, চিত্রশিল্পীরা ছবি তৈরি করবে। একাত্তরের পরে আমাদের একটা রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল, পঁচাত্তরে নির্মমভাবে সেটাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি স্বপ্ন দেখি আমাদের এই তরুণেরা সেই অসমাপ্ত রেনেসাঁ আবার শুরু করবে। স্বাধীনতার পরপর আমাদের অনেক শখ ছিল, সাধ্য ছিল না। এই তরুণদের শখ আর সাধ্য দুটোই আছে। আমরা তাদের সৃজনশীলতার ছোঁয়া দেখতে শুরু করেছি। কিছুদিন আগেও যদি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা আমাকে বলত, "স্যার, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে শেষ পুরো দুই কিলোমিটার পথ ক্যানভাসের মতো রঙিন ছবি দিয়ে ভরে ফেলব।" আমি নিশ্চিত তাদের বলতাম, "তোমাদের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে তাই এ রকম অবাস্তব কথা বলছ।" আমি এবারে তাদের সেই কথা বলিনি আর সত্যি সত্যি শত শত ছেলেমেয়ে মিলে রাত-দিন খেটে দুই কিলোমিটার পথকে অপূর্ব একটি শিল্পকর্মে পাল্টে দিয়েছে। এই উৎসাহ, এই প্রেরণা এত দিন কোথায় লুকিয়ে ছিল?

আমি সুযোগ পেলেই নূতন প্রজন্মকে বলতাম, আমাদের প্রজন্ম তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, তারা মুক্তিযুদ্ধ করে তোমাদের একটি দেশ উপহার দিয়েছে। তাদের দায়িত্ব শেষ—এখন তোমাদের বাকি দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের হাতে এখনো পুরোপুরি দায়িত্বটুকু যায়নি, কিন্তু আমি জানি তারা পুরোপুরি প্রস্তুত।

আমি সেটা কেমন করে জানি? কিছুদিন আগে ছোট একটা মেয়ে আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে, সেই চিঠিতে তার দেশের জন্যে গভীর ভালোবাসার কথা। এত ছোট একটা মেয়ে তার দেশকে এত তীব্রভাবে ভালোবাসতে পারে দেখে আমার চোখ ভিজে আসে। চিঠির শেষে সে আমাদের জাতীয় সংগীতটির প্রথম লাইনটি এভাবে লিখেছে : আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় অনেক অনেক অনেক ভালোবাসি।

আমাদের প্রজন্ম সোনার বাংলাকে শুধু ভালোবেসেছে—এই নূতন প্রজন্ম অনেক অনেক অনেক ভালোবাসে।

আমি যদি এই প্রজন্ম নিয়ে স্বপ্ন না দেখি তাহলে কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব?

লেখার তারিখ : মার্চ ১৪, ২০১৩

[দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত]

একাত্তরের দ্বিতীয় পাঠ

আজকাল চিঠি লেখালেখি খুব কমে এসেছে—চিঠি লিখে যে কথাটি জানাতে হবে টেলিফোন করে অনেক তাড়াতাড়ি সে কথাটি জানিয়ে দেওয়া যায়। এসএমএস কিংবা ই-মেইল আছে, ফেসবুক আছে, তাই কে আর এত সময় নিয়ে চিঠি পাঠাবে। আমার ধারণা আমি সম্ভবত এই দেশের অল্প কয়জন সৌভাগ্যবান মানুষের একজন যে এখনো নিয়মিত চিঠি পাই! আমার চিঠিগুলো খুব মজার হয়, কারণ তার বেশিভাগই লেখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

শাহবাগের গণজাগরণ শুরু হওয়ার পর চিঠিগুলোকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—এক ভাগ লিখছে যারা শাহবাগে আসতে পারছে তারা, অন্য ভাগে রয়েছে যারা আসতে পারছে না তারা। যারা আসতে পারছে না তাদেরকেও আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—এক ভাগে রয়েছে যারা ঢাকার বাইরে থাকে তারা, অন্য ভাগে রয়েছে সবচেয়ে ক্ষুব্ধ অংশটুকু। যারা ঢাকায় থাকে ইচ্ছে করলেই তারা শাহবাগে আসতে পারে কিন্তু তাদের বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন তাদের আসতে অনুমতি দিচ্ছে না। আমার কাছে তারা লম্বা লম্বা চিঠি লিখে সেই দুঃখের কাহিনী জানায়।

বাচ্চাদের চিঠিগুলোতে নানা প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য থাকে এবং নানা ধরনের গল্প থাকে। একজন লিখেছে তার পরিচিত একজন রাজাকার টাইপের আত্মীয় আছে, সে শাহবাগে যাচ্ছে শুনে সেই রাজাকার টাইপ আত্মীয় মুখ কালো করে বলেছে, "দেশটাকে দুই ভাগ করে এখন গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার ব্যবস্থা!" বাচ্চাটি তখন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে হাতে কিল দিয়ে বলেছে, "কী মজা! এইটাই তো চাই! মুক্তিযুদ্ধ করতে পারি নাই—এখন যুদ্ধ করব!" তার কথা শুনে রাজাকার টাইপ আত্মীয়ের মুখের ভাব কেমন হয়েছে সেটাও সে অনেক মজা করে বর্ণনা করেছে!

সত্যি সত্যি এই দেশে গৃহযুদ্ধ হয়ে যাবে আর এই দেশের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা দেশদ্রোহী রাজাকারদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেবে, আমি মোটেও সে

জন্যে অপেক্ষা করে নেই। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বড় হয়েছি, তারা জানি একটা যুদ্ধে যে রকম সাহস, বীরত্ব আর অর্জন থাকে তার পাশাপাশি থাকে ভয়াবহ নৃশংসতা, দুঃখ, কষ্ট আর হাহাকার। আমরা সব সময় সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি এই দেশের মাটিতে আর কখনো যেন কাউকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে না হয়।

কিন্তু এই কথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, ছোট ছেলেমেয়েদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাস দেখে একটি বিষয় বোঝা যায়, তারা মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সত্যিকারভাবে অনুভব করতে পেরেছে। এই দেশের প্রায় সত্তর ভাগ হচ্ছে তরুণ, এই তরুণ প্রজন্ম যদি মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে ধারণ করতে পারে তাহলে এই দেশে যে পুঞ্জীভূত শক্তি রয়েছে সেই শক্তিকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কার আছে? এই দেশকে নিয়ে আর যে-ই দুর্ভাবনা করুক আমি করি না।

তবে একটি সত্য কেউ অস্বীকার করবে না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ শুরু হবার সাথে সাথে সেই যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্যে জামায়াত-শিবির যে তাণ্ডব শুরু করেছে, এই দেশের নূতন প্রজন্ম কখনো এই তাণ্ডব দেখেনি। তাদের অনেকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে একাত্তরের নৃশংসতা কেমন ছিল। এটি হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দল যেটি একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আজ্ঞাবহ হয়ে এই দেশে গণহত্যায় অংশ নিয়েছিল। সে সময়ে তাদের নৃশংসতা কত ভয়াবহ ছিল এখন অনেকে সেটা আঁচ করতে শুরু করেছে। আমরা কি কখনো কল্পনা করেছিলাম যে আমরা টেলিভিশনে দেখব একজন পুলিশের মাথা থেঁতলে দেওয়া হচ্ছে? গাড়ির ভেতরে মানুষকে রেখে সেই গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে? ককটেল মেরে স্কুলের শিশুকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে? একাত্তরের যে বিভীষিকাটি আবার নূতন করে আমাদের হতবাক করে দিচ্ছে সেটি হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া। আমরা কি কখনো কল্পনা করেছিলাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করার জন্যে তারা দেশের এই জনগোষ্ঠীকে নির্যাতন করার পথ বেছে নেবে? একটি দিনও প্রায় না যখন আমরা দেখি না এই দেশের কোথাও না কোথাও একটি মন্দিরে আগুন দেওয়া হচ্ছে না।

এই সব কিছুর পাশাপাশি আমরা দেখছি ধর্মের অপব্যবহার। খবরের কাগজে কাবা-ঘরকে নিয়ে মিথ্যাচার করা হয়, চাঁদে যুদ্ধাপরাধীর ছবি দেখা হয়। বিশাল গণ আন্দোলনকে ভুল দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে নাস্তিক-আস্তিক প্রসঙ্গ তুলে আনা হয়। একজন ধর্মভীরু মানুষ কখনোই ধর্মকে এভাবে ব্যবহার করতে পারে না কিন্তু একাত্তরে যেভাবে ধর্মের নামে এ দেশে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা হয়েছিল ঠিক একইভাবে এই দেশে সেই একই গোষ্ঠী এই নূতন প্রজন্মের বিরোধিতা করার জন্যে তাদের সকল শক্তি নিয়ে পথে নেমেছে।

আমরা এই মিথ্যাচার, অন্যায়, অবিচার, নৃশংসতা, বিভীষিকা, সাম্প্রদায়িকতায় অভ্যস্ত নই। আমি জানি এই দেশের মানুষ, নূতন প্রজন্ম কখনো কখনো আতঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে, কখনো কখনো হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। নূতন প্রজন্ম যে রকম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে অনুপ্রেরণা পায়, তাদেরকে ঠিক একইভাবে এই দুঃসময়ে আবার

একাত্তরের কাছে ফিরে যেতে হবে! তাদেরকে মনে রাখতে হবে, একাত্তর থেকে বড় দুঃসময় এ দেশে কখনো আসেনি–অপ্রস্তুত একটি জাতিকে যুদ্ধের মাঝে ঠেলে দেয়া হয়েছে, পাকিস্তানি মিলিটারি গণহত্যা করে যাচ্ছে, রাজাকার-আলবদর তাদের সাহায্য করছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, এক কোটি মানুষ পাশের দেশে শরণার্থী হয়ে গেছে, মেয়েদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, বাইরের পৃথিবী চুপচাপ দেখছে, চীন-আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষে, মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের পক্ষে—কত দীর্ঘদিন যুদ্ধ হবে কেউ জানে না, ভয়ংকর অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যৎ। সেই ভয়ংকর দুঃসময়েও এই দেশের মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত হয়নি, জীবনের সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের নূতন প্রজন্মকে একাত্তরের সেই শিক্ষাটি নিতে হবে, কিছুতেই হতাশাগ্রস্ত হওয়া যাবে না। দেশদ্রোহী ধর্মান্ধদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। তাদেরকে নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে—একাত্তরের ভয়ংকর দুঃসময়েও এই দেশের মানুষ নিজের জীবন বাজি করে রুখে দাঁড়িয়েছে, তাহলে এই নূতন প্রজন্ম এখন কেন পারবে না?

নূতন প্রজন্ম দেশপ্রেমের প্রথম পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে পাস করেছে—আমাদের দেখিয়েছে তারা মুক্তিযুদ্ধকে হৃদয়ের ভেতরে লালন করে। অপপ্রচার, আতঙ্ক, সাম্প্রদায়িকতা, নৃশংসতা, বিভীষিকার কালো ছায়ার মাঝে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আশাবাদী হয়ে থাকার দ্বিতীয় পরীক্ষাটিতেও তাদের পাস করতে হবে।

এ দেশটি আমাদের—যে স্বপ্ন নিয়ে এই দেশটির জন্ম হয়েছিল, নূতন প্রজন্মকেই আমাদের সেই দেশ উপহার দিতে হবে।

[লেখার তারিখ : এপ্রিল ২০, ২০১৩]

প্রিয় সজল

এয়ারপোর্টে পরের ফ্লাইট ধরার জন্যে বসে আছি তখন আমার মেয়ে এসে আমাকে বলল, এভারেস্ট অভিযানে বাংলাদেশের একজন মারা গেছে। মানুষটি কে, কীভাবে মারা গেছে কিছুই শুনিনি কিন্তু মুহূর্তে আমার জগৎটি গভীর বিষাদে ঢেকে গেল। আমি সাথে সাথে বুঝে গেলাম সজল আর নেই। এই সুদর্শন প্রতিভাবান তরুণটিকে আমরা দেখব না। মাটির মানুষ হয়ে সুউচ্চ অহংকারী এভারেস্টকে পদানত করার অপরাধে পর্বতটি আরো একজন পর্বতারোহীর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে।

আমি জানতাম সজল দ্বিতীয়বারের জন্যে এভারেস্টে যাচ্ছে, মুহিত যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘায়। বছরের এই সময়টাতে আমাদের তরুণ অভিযাত্রীরা হিমালয়ের চূড়ায় ওঠে। দুরু দুরু বক্ষে আমরা সেই প্রতীক্ষিত এসএমএস-এর জন্যে বসে থাকি যখন আমাদের জানানো হবে দেশের তরুণেরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আবার সুস্থ দেহে নিচে ফিরে এসেছে। এবারে ভাগ্য আমাদের নিষ্ঠুরভাবে বিমুখ করেছে, এভারেস্ট সজলকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়নি। তার দুই বছরের বাচ্চাটি যখন বড় হবে তার কাছে দুঃসাহসী বাবার কোনো স্মৃতি থাকবে না। একটা গভীর বেদনায় আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে গেল।

আমি সজলকে জানতাম ফিল্ম মেকার হিসেবে, সে যে একই সাথে একজন পর্বতারোহী সেটা আমি জেনেছি পরে। আমাদের নূতন প্রজন্ম একাত্তরকে গভীরভাবে অনুভব করে, সজলও তাদের একজন। একাত্তরের শব্দসেনা নামে তার একটি অসাধারণ ডকুমেন্টারি রয়েছে। আমার সাথে তার পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতা হয়েছিল যখন সে আমার একটি কিশোর উপন্যাসকে (কাজলের দিনরাত্রি) চলচ্চিত্রায়িত করার পরিকল্পনা করেছিল। এই দেশে সিনেমা তৈরি করার মতো কঠিন কাজ আর কিছু হতে পারে না—তার পরেও অসাধারণ দক্ষতায় সে চলচ্চিত্রটি শেষ করেছিল। শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি যখন প্রথম দেখানো হয়েছিল সজলের সাথে আমিও সেখানে ছিলাম।

ছবিটা শেষ হওয়ার পর বাচ্চাদের আনন্দোল্লাস শুনে আমার বুকটি ভরে গিয়েছিল, সজলের মুখের হাসিটির কথা আমি কোনো দিন ভুলব না। সে বাচ্চাদের আনন্দ দিতে পারে এ রকম একটি ছবি তৈরি করতে পেরেছে, এর চাইতে আনন্দের আর কী হতে পারে। মার্চ মাসে ছবিটি রিলিজ করার কথা ছিল, এভারেস্টে যাবার প্রস্তুতির জন্যে সজল সম্ভবত সেটা একটু পিছিয়েছিল। এখন হঠাৎ করে সব কিছু অর্থহীন হয়ে গেছে। ছবিটি মাত্র কিছুদিন আগে আমার কাছে যেটুকু আনন্দের ছিল এখন ঠিক ততটুকু দুঃখের।

বাংলাদেশের মতো সমতল দেশের তরুণেরা যখন পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে সেটি ছিল আমাদের সবার জন্যে সাফল্য আর অর্জনের একটি নূতন দিগন্ত। এই তরুণেরা তাদের সকল অর্জন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির জন্যে উৎসর্গ করে এসেছে, আমাদের প্রজন্ম যেটা পারেনি এই নূতন প্রজন্ম সেটি করেছে—দেশের শিশু-কিশোরকে দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। তাদের অভাবনীয় সাফল্য দেখে সাধারণের মনে হতে পারে কাজটি বুঝি সহজ, কিছু সময়, কিছু ট্রেনিং আর কিছু স্পন্সর হলেই বুঝি একজন এভারেস্টে যেতে পারে। কিন্তু এটি যে কত কঠিন সেটা শুধুমাত্র পর্বতারোহীরাই জানে—সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা কল্পনা পর্যন্ত করা সম্ভব নয়। আট হাজার মিটার কিংবা পঁচিশ হাজার ফুটের ওপর উচ্চতায় আসলে মানুষের বেঁচে থাকার কথা নয়, আক্ষরিক অর্থে এটি হচ্ছে মৃত্যু উপত্যকা। যারা বেঁচে থাকে তারা শুধুমাত্র তাদের শারীরিক আর মানসিক শক্তির জোরে নিশ্চিত মৃত্যুকে পরাস্ত করে বেঁচে থাকে। এত দিন আমরা শুধু সাফল্যের কথা জেনে এটাকে একটা দুঃসাহসিক অভিযান হিসেবে জেনে এসেছি, সজলের মৃত্যুর ঘটনাটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে এটি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে আসা। মৃত্যু কখনো কখনো আলিঙ্গন থেকে অভিযাত্রীদের মুক্ত করে দেয়। কখনো কখনো করে না। সজলকে করেনি।

সজল সেটি জানত, আমরা যেটুকু জানতাম সে তার থেকে বেশি জানত। এর আগে সে হিমালয়ের অন্য চূড়ায় উঠেছে, এভারেস্টের কঠিন পথেও চেষ্টা করেছে। সব কিছু জেনেও সে সেই পথে গিয়েছে, বাংলাদেশের পতাকাটি এভারেস্টের চূড়ায় উড়িয়ে এসেছে। ফিরে এসে আমাদের সেই কাহিনীটা বলতে পারেনি—এই কষ্টটি আমরা কোথায় রাখব?

প্রিয় সজল, তোমাকে আমরা ভুলব না, তোমার অভাবটি কেউ পূরণ করতে পারবে না।

[লেখার তারিখ : মে ২৪, ২০১৩]

আমার পুলিশ অফিসার বাবা

আমার পুলিশ অফিসার বাবা ৫০ বছর ২ মাস ১৪ দিন বয়সে মারা গিয়েছিলেন। মানুষ মারা গেলে তার বয়স আর বাড়ে না, অন্যদের বাড়ে। তাই ২০০৩ সালের কোনো এক সময়ে হঠাৎ করে আমি আবিষ্কার করলাম আমার বয়স বাবার থেকে বেশি হয়ে গেছে। একদিন আমার মা-ভাই-বোন সবার সামনে আমি ঘোষণা করলাম যেহেতু আমি বয়সে আমার বাবা থেকে বড় তাই আমি তাকে ইচ্ছে করলে নাম ধরে ডাকতে পারি। ব্যাপারটি কেমন শোনায় দেখার জন্যে আমি কয়েকবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকারও চেষ্টা করলাম এবং সবাই আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসাহাসি করল।

মৃত্যুর পর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পার হয়ে গেলে হয়তো সেটাকে সহজভাবে নেওয়ার চেষ্টা করা যায় কিন্তু আসলে সেটা কখনোই সহজ হয় না। আমি মাঝে মাঝেই ভাবি আমার বাবা যদি হঠাৎ করে এখন ওপর থেকে হাজির হতেন তাহলে আমাদের দেখে তার কী প্রতিক্রিয়া হতো? আমরা তাকে নিয়ে কী করতাম? তাকে কী দেখাতাম, তার সাথে কী নিয়ে কথা বলতাম? তাকে দেখে আমাদের কী মনে হতো?

আমাদের সবার স্মৃতিতে আমার বাবার অসাধারণ রূপবান চেহারার স্মৃতিটাই রয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর আমি যখন নিজ হাতে কবর খুঁড়ে আমার বাবার দেহাবশেষটি বের করেছিলাম সেখানে তখন তার অসাধারণ রূপের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না, তাই আমি সেটি আমার মা কিংবা বোনকে দেখতে দিইনি। আমার মনে হয়েছিল সেটি হয়তো আমার নিজের স্মৃতিটাকে বিপন্ন করে দেবে, কিন্তু বাস্তবে সেটি ঘটেনি। আমি যখন আমার বাবার কথা ভাবি তখন কবরে পা ভাঁজ করে শুয়ে থাকা একটি অসহায় দেহাবশেষের ছবি আমার চোখে ভেসে ওঠে না, বারান্দায় কোমরে হাত দিয়ে সিগারেট মুখে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা আমার সেই রূপবান বাবার চেহারাটিই ভেসে ওঠে। আমার শৈশবের অজস্র স্মৃতিকে বাবার জীবনের শেষ দিনগুলোর ভয়াবহতা ম্লান করে দিতে পারেনি।

আমাদের চারপাশে যারা থাকে তারা সবাই সব সময়েই কিছু না কিছু করে। আমি আমার বাবাকে দেখে প্রথম শিখেছিলাম যে মাঝে মাঝে কিছু না করে আনমনা হয়ে বসে থাকা যায়, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় এবং চোখের দৃষ্টি উদাসী করে দেওয়া যায়। আমার অসম্ভব রূপবান এই বাবা হাতে সিগারেট নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন সেই দৃশ্যটি আমাদের এত অভিভূত করেছিল যে আমরা তিন ভাই বয়স হওয়া মাত্রই প্রাণপণে সিগারেট খাওয়া শেখার চেষ্টা করেছিলাম! বাবা যে খুব সিগারেট খেতেন তা নয় কিন্তু যখন খেতে চাইতেন তখন একটা সিগারেটের জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আমরা তখন ছোট, স্কুলে পড়ি। একদিন সকালবেলা সিগারেট ধরাতে গিয়ে বাবা তার সিগারেটের প্যাকেট খুঁজে পান না। খানিকক্ষণ খুঁজে সেটা না পেয়ে ঘোষণা দিলেন, যে তাকে পাঁচ মিনিটের ভেতর একটা সিগারেট খাওয়াতে পারবে তাকে এক টাকা পুরস্কার দেবেন। (আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন এক টাকা রীতিমতো সাত রাজার ধন।) আমার সব ভাই-বোন তখন পাগলের মতো সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজতে লাগল। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে এক আনা নিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় বের হয়ে ছুটতে লাগলাম। গলি শেষে রাস্তা, রাস্তার মোড়ে একটা পান-সিগারেটের দোকান, সেখান থেকে এক শলা "ক্যাপস্টেন" সিগারেট কিনে আবার ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে বাসায় এসে বাবার হাতে সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। বাবার মুখে হাসি, আমার পকেটে চকচকে এক টাকার নোট, ভাই বোনদের হিংসাতুর দৃষ্টি—পৃথিবীতে এর থেকে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে?

মানুষ যখন ছোট থাকে সে ধরে নেয় তার বাবা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যখন সে আস্তে আস্তে বড় হয় তখন ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে তার মাঝে ক্ষুদ্রতা, নীচতা আছে, সীমাবদ্ধতা আছে, নিষ্ঠুরতা আছে এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি খুব সাধারণ একজন মানুষে পরিণত হয়ে যায়। আমাদের বেলায় সেটা ঘটেনি। এই পরিণত বয়সে আমি যখন আমার বাবার কথা ভাবি তখন মাঝে মাঝে আমি হতবাক হয়ে যাই।

বাবা খুব ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। নামাজ পড়ার সময় সুরা ফাতেহার পর পরিচিত ছোট একটা সুরা না পড়ে প্রায় সময়েই কোরান শরিফের অংশ থেকে পড়তেন। প্রিয় সুরা ছিল সুরা রাহমান, ফাবি আইয়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান (তোমার প্রভুর কোন অনুগ্রহটি তুমি অস্বীকার করবে?) এই ছন্দময় বাক্যটি তার মুখ থেকে শুনতে শুনতে আমাদের স্মৃতিতে গেঁথে গেছে। আমার এই ধর্মপ্রাণ বাবা আমাকে সেই শৈশবে সেক্যুলার হতে শিখিয়েছিলেন। একদিন কাগজে একটা বৃত্ত এঁকে তার মাঝখানে একটা বিন্দু বসিয়ে আমাকে বললেন, মনে কর এটি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, সবাই এখানে যেতে চায়। তারপর বৃত্তের এক জায়গায় কলমটি বসিয়ে বললেন, মনে কর এটা হচ্ছে ইসলাম ধর্ম, তারপর কলমটি বৃত্তের মাঝখানের বিন্দুর কাছে যেতে যেতে বললেন, ইসলাম ধর্ম এই পথে সৃষ্টিকর্তার কাছে যায়। তারপর কলমটা বৃত্তের আরেক জায়গায় রেখে বললেন, মনে কর এটা হচ্ছে হিন্দু ধর্ম। তারপর কলমটা মাঝখানের বিন্দুটার

দিকে নিতে নিতে বললেন, হিন্দুরা এই পথে সৃষ্টিকর্তার কাছে যাচ্ছে। ইসলাম ধর্মের পথ থেকে ভিন্ন কিন্তু এটাও একটা পথ। তারপর কলমটা বৃত্তের অন্য জায়গায় রেখে বললেন, মনে কর এটা হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম; তারপর আমাকে দেখালেন অন্য একটা পথে তারা কীভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছেছে। এভাবে আমার বাবা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন পৃথিবীর যত ধর্ম, যত বিশ্বাস আছে সবাই আসলে একইভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, শুধু তাদের পথটা ভিন্ন।

সেই শৈশবে আমার বাবা আমাকে যেটা শিখিয়েছিলেন তার থেকে সুন্দর কিছু আমি অন্য কোথাও অন্য কারো কাছে শিখেছি বলে মনে পড়ে না।

একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে আমার বাবাকে সম্ভবত সারাক্ষণই চোর-ডাকাত, খুনি-ধর্ষক, প্রতারক-অপরাধীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে কিন্তু তারা তাদের মনকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করতে পারেনি। দার্শনিকের মতো একজন মানুষ, সাহিত্যের জন্যে গভীর ভালোবাসা কিন্তু কাজকর্মে পুরোপুরি ছেলেমানুষের মতো সহজ-সরল। গ্রামের বাড়ি থেকে হয়তো কেউ শহর দেখতে বেড়াতে এসেছে। সারা দিন শহরের দর্শনীয় স্থান দেখে রাতে সেকেন্ড শো সিনেমা দেখতে গিয়েছে, বাবা তখন আমাদেরকে নিয়ে পরিকল্পনা করতে বসেছেন কেমন করে তাদের ভূতের ভয় দেখানো যায়। বাবা হাত উঁচু করে দাঁড়ালেন আর আমরা শাড়ি প্যাঁচিয়ে তাকে লম্বা একটা ভূতের রূপ দিয়ে দিলাম। সেকেন্ড শো দেখে গ্রামের অতিথি যখন সরল বিশ্বাসে ঘরে ঢুকেছে তখন এই লম্বা ভূত দেখে তার আতঙ্ক, চিৎকার, হুটোপুটি দিয়ে যা একটা কাণ্ড হলো তার কোনো তুলনা নেই। ঘরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থেকে পুরো দৃশ্যটা দেখে আমরা হেসে লুটোপুটি খেলাম। বাবার কাছ থেকে পাওয়া এই শিক্ষা আমাদের জীবনে বৃথা যায়নি। বড় হয়ে আমরা সবাই কখনো না কখনো কাউকে না কাউকে ভূতের ভয় দেখিয়ে বিমলানন্দ পেয়েছি!

বয়স্ক একজন মানুষ আমাদের নিয়ে এই ছেলেমানুষি আনন্দ করছেন আবার গভীর আগ্রহ নিয়ে তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ পড়তে শিখিয়েছেন। অক্ষর জ্ঞান হওয়ার আগে আমার বাবা আমাকে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন কবিতাটি শিখিয়েছিলেন। সেই কবিতার লাইনগুলো এ রকম : আমি যে দেখেছি—প্রতিকারহীন, শক্তের অপরাধে/বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে—আমি চার বছরের বাচ্চা তার একটা লাইনেরও অর্থ বুঝি না কিন্তু হাত-পা নেড়ে গভীর আবেগ দিয়ে সেটা আবৃত্তি করে যাচ্ছি, এর চাইতে মজার দৃশ্য আর কি হতে পারে? বাবা পুলিশের চাকরি করেন, স্বল্প বেতন, বাড়িতে টাকা পাঠাতে হয়, আত্মীয়স্বজন বাসায় থেকে পড়াশোনার চেষ্টা করে, আমার মা কেমন করে সংসার চালাতেন সেটা এখনো একটা রহস্য! এর পরেও বাবার বিশাল একটি বিলাসিতা ছিল, সেটি হচ্ছে বই। "বই কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না" যারা বলেন তাদের আসলে টাকা-পয়সার অভাব নেই কিন্তু বই কেনার কারণে যে সংসার অচল হয়ে যেতে পারে আমার মা তার সাক্ষী দেবেন। আমাদের বাসা বোঝাই ছিল বই। অক্ষর জ্ঞান হওয়ার আগে বই উল্টেপাল্টে ছবি খুঁজে বেড়িয়েছি। পড়া শেখার পর

সবাই গোগ্রাসে বই পড়েছি। বই পড়ার সবচেয়ে তীব্র নেশা ছিল অগ্রজ হুমায়ূন আহমেদের, মনে হয় সে জন্যেই সে এত সুন্দর লিখতে শিখেছিল। বাবা নিজেও লিখতেন, এখনকার মতো তখন বই প্রকাশ করা এত সহজ ছিল না, তাই তার লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো যত্ন করে ট্রাঙ্কের মাঝে রাখা ছিল, একাত্তরে বাসা লুট করে নেওয়ার সময় সেগুলো চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে, সেই দুঃখ আমি কখনো ভুলতে পারি না।

১৯৭১ সালের মে মাসের ৫ তারিখ পাকিস্তানি মিলিটারি আমার বাবাকে বলেশ্বরী নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। একাত্তরে কাউকে খুন করার জন্যে পাকিস্তানি মিলিটারি বা তাদের আজ্ঞাবহ দেশি অনুচরদের কোনো কারণের প্রয়োজন হয়নি। বাবার বেলায় হয়তো একটু কারণও ছিল। পাকিস্তানি মিলিটারি আসার আগে যে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল বাবা তাদের সাহায্যও করেছিলেন। যারা বাবাকে হত্যা করতে দেখেছে, লোকমুখে শুনেছি তারা বলেছে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আমার বাবা নাকি হাত তুলে খোদার কাছে বলেছিলেন, খোদা তোমাকে সব সময় ডাকার সময় পাইনি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। খোদা তুমি আমার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে রেখো।

খোদা আমার বাবার কথা রেখেছিলেন, তার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে রেখেছিলেন।

[বাংলাদেশ পুলিশ-এর বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০১৩-এ প্রকাশিত]

সাম্প্রতিক ভাবনা

১.

এপ্রিলের ৬ তারিখ বিকেলে আমি শাহবাগে বসেছিলাম, সেদিন মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের বিশাল সমাবেশ ছিল। সরকারের হিসেবে সেটা শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হলেও শাহবাগে বসে আমার সে রকম মনে হয়নি। সেখানে এক ধরনের উত্তেজনা ছিল। হেফাজতে ইসলামের একটা দল বারবার হামলা করার চেষ্টা করছিল। সেখানে বসে আমি যখন স্লোগান শুনছি তখন একটি মেয়ে আমার কাছে এসে বলল, "স্যার, দেশে কী হচ্ছে? আমার মনটা ভালো নেই, কিছু একটা বলে আমাকে সাহস দেন।" আমি সাধারণত যে কথাগুলো বলি তাকে সেগুলোই বললাম, সাহস দিলাম।

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর আমি পুরো ব্যাপারটি নিয়ে ভাবার চেষ্টা করলাম, মনে হলো সত্যিই তো মেয়েটির মন খারাপ তো হতেই পারে। শত বাধা-বিপত্তির মাঝেও যে আমাদের দেশটি এগিয়ে যাচ্ছে, তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এখানে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমান অধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সেই নারীদের প্রতি তীব্র অসম্মান দেখানোর পরেও আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দল হেফাজতে ইসলামকে এত তোয়াজ করে যাচ্ছে কেন? শাহবাগের তরুণেরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলছে, তাদের ওপর হেফাজতে ইসলামের এত রাগ কেন? এই দেশে ইসলাম বিপন্ন—কখনো কারো এই কথা মনে হয়নি, তাহলে হঠাৎ সেই ইসলামকে হেফাজত করার প্রয়োজন হলো কেন?

ধর্ম তো আমাদের জীবন থেকে খুব দূরের কিছু নয়। একটা শিশুর জন্ম হলে প্রথমেই একজন মুরব্বি খুঁজে বের করা হয় যে শিশুটির কানে আজান শোনাতে পারেন। একটু বড় হলে অবধারিতভাবে একজন হুজুরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বাচ্চাদের কোরান শরিফ পড়ানোর জন্যে আরবি শেখাতে। ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় টুপি পরে আর মেয়েরা মাথায় ওড়না দিয়ে আলিফ জবর আ বে জবর বা পড়তে শিখে।

জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার আগে ছেলেমেয়েরা আমার সাথে যোগাযোগ করে বলে, "স্যার, আমার পরীক্ষা, আমার জন্যে দোয়া করবেন!" আমি সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলি, "খোদা, এই বাচ্চাটার পরীক্ষা ভালো করে দিও।" সবচেয়ে মজা হয় যখন হঠাৎ একজন উত্তেজিত হয়ে বলে, "স্যার, মনে আছে, আপনি আমার জন্যে দোয়া করেছিলেন? সেই জন্যে আমি মেডিক্যালে চান্স পেয়ে গেছি!" আমার দোয়ায় এত ধার নেই তাহলে এই দেশে আরো অনেক কিছু ঘটে যেত—আমি সেটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, সে বুঝতে চায় না। নিজের যোগ্যতায় নয় আমার দোয়ার কারণে সুযোগ পেয়ে গেছে সেটা বিশ্বাস করতেই তার আগ্রহ বেশি তাই আমি তর্ক করি না!

বছরখানেক আগে আমার একজন সহকর্মী যে একসময় আমার ছাত্র ছিল, ভয়ংকর একটা একসিডেন্টে পড়ে সেখান থেকে ফোন করেছে মুখোমুখি বাস দুর্ঘটনায় ষোলজন সেখানেই মারা গেছে, আহত সহকর্মীকে ঢাকায় এনে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করার ফাঁকে আমি আমার মাকে ফোন করে বলেছি, "মা, আমার একজন টিচার একসিডেন্ট করেছে—তার জন্যে দোয়া করেন।" আমার মা তখন তখনই তার জন্যে দোয়া করার জন্যে জায়নামাজে বসে গেছেন। বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ মারা যাওয়ার পর তার কুলখানিতে কোরান খতম করার জন্যে ছোট ছোট বাচ্চা পাঁচ-ছয়জন মেয়ে এসেছিল, এইটুকু বয়সে তারা কোরান হাফেজ। মাথা দুলিয়ে সুরেলা গলায় কোরান শরিফ পড়ে কয়েক ঘণ্টার মাঝে তারা কোরান শরিফ শেষ করে ফেলল। (আমি তাদের আমার লেখা কয়েকটা বই দিলাম, ভূতের বইটা পেয়ে তাদের কী আনন্দ!) একদিন নুহাস পল্লীতে বসে আছি, তখন সাত-আটজন অত্যন্ত সুদর্শন তরুণ আমাকে ঘিরে ধরল ছবি তোলার জন্যে। ছবি তোলার পর জানতে পারলাম তারা সবাই একে অপরের কাজিন এবং সবাই কোরান হাফেজ। হুমায়ূন আহমেদের জন্যে কোরান খতম করে তারা তার কবরে এসেছে তার জন্যে দোয়া করার জন্যে—শুনে কেন জানি আমার চোখে পানি এসে গেল।

আমাদের কাছে এটাই হচ্ছে ধর্ম, এর মাঝে শুধু একজনের জন্যে আরেকজনের ভালোবাসা। যখন দুঃখ-কষ্ট-হতাশা এসে ভর করে তখন ধর্ম একটা সান্ত্বনা নিয়ে আসে, একটা ভরসা নিয়ে আসে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মায়েরা তাদের সন্তানের মাথায় হাত রেখে "ফি আমানিল্লাহ" বলে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। সন্তানরা হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে গেছে, যুদ্ধ শেষে কেউ কেউ ফিরে এসেছে, সৃষ্টিকর্তা কাউকে কাউকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। আমি একজন মায়ের কথা জানি যিনি তার মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের জন্যে টানা ৯ মাস রোজা রেখেছিলেন। আমার নিজের মা শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার ওপর ভরসা করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বুক আগলে আমাদের ভাই-বোনদের রক্ষা করেছিলেন। এই দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এটাই হচ্ছে ধর্মের রূপ, এর মাঝে শুধুমাত্র ভালোবাসা আর শান্তি, আছে বিশ্বাস এবং ভরসা।

সেই ধর্মকে হেফাজত করার জন্যে এপ্রিলের ৬ তারিখ যখন মতিঝিলের শাপলা চত্বরে কয়েক লক্ষ পুরুষ মানুষ জড়ো হয়েছিল তখন কেন এই দেশের মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের বুক কেঁপে উঠেছিল? এই দেশের অর্ধেক মানুষ মেয়ে, সেই মেয়েদের অবমাননা করার ঘোষণা দেওয়া হেফাজতে ইসলামের ধর্মের সাথে আমাদের পরিচিত শান্ত-কোমল ভালোবাসা সহনশীলতা-সহমর্মিতার ধর্মের মাঝে এত পার্থক্য কেন? তাদের রাজনীতির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সেই কথাটি একশ বার জোর গলায় ঘোষণা দেওয়ার পরও বিএনপির বড় বড় নেতারা কেন মঞ্চে গিয়ে বসে থাকলেন? এই দেশে রং বদল করতে সবচেয়ে পারদর্শী জেনারেল এরশাদ কেন তাদের পানি খাইয়ে সেবা করার জন্যে এত ব্যস্ত হলেন? জামায়াতে ইসলামী হঠাৎ করে কেন হেফাজতে ইসলামের মাঝে তাদের আদর্শ খুঁজে পেতে শুরু করল? নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমানও কেন হেফাজতে ইসলামকে সমর্থন জানিয়ে রাখলেন?

২.

শাহবাগের তরুণেরা যখন যুদ্ধাপরাধীদের সঠিক বিচারের দাবিতে একটা বিস্ময়কর জাগরণের জন্ম দিয়েছিল তখন হঠাৎ করে তাদের সবাইকে ঢালাওভাবে নাস্তিক দাবি করে একটা প্রচার শুরু হলো। একজন মানুষ যদি শুধুমাত্র নিজে থেকে নিজেকে নাস্তিক হিসেবে ঘোষণা দেয় তাহলে হয়তো তাকে নাস্তিক বলা যায়, অন্যদের পক্ষে কোনোভাবেই একজনকে নাস্তিক বলা সম্ভব নয়। একজন মানুষকে নানাভাবে গালাগালি করা এক কথা কিন্তু তাকে নাস্তিক বা মুরতাদ বলা সম্পূর্ণ অন্য একটি ব্যাপার। এটি আসলে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা, ধর্মান্ধ মানুষ এই ঘোষণাটি মেনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে এ রকম উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে। কাজেই একজন মানুষ বা একদল মানুষকে নাস্তিক ঘোষণা দেওয়া আসলে তাকে প্রাণের ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া। রাজনৈতিক নেতারা সেটা নিয়ে দুর্ভাবনা করবেন কিংবা সত্যি সত্যি তাদের অপবাদের কারণে কেউ একজন খুন হয়ে গেলে তারা খুব অপরাধবোধে ভুগবেন, সেটা কেউ বিশ্বাস করে না। সত্যি কথা বলতে কী, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। একজন মানুষের মৃত্যু তাদের কাছে স্বজনহারা মানুষের বুকভাঙা হাহাকার নয়, সেটি রাজনীতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি "লাশ"। কে কত দক্ষভাবে সেই লাশটা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে, কত ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি করতে পারবে সেটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাই খালেদা জিয়া প্রকাশ্য সভায় জনতার কাছে লাশ চাইতে দ্বিধা করেননি।

"আমার দেশ" পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান যখন আনুষ্ঠানিকভাবে শাহবাগের তরুণদের নাস্তিক ঘোষণা দিয়ে প্রচারণা শুরু করেছিলেন তখন তার ভেতরে কোনো অপরাধবোধের জন্ম হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। আমি মোটামুটি লিখে দিতে পারি শাহবাগের সব তরুণ নাস্তিক সেটা তারা নিজেরাও বিশ্বাস করেন না, কিন্তু

সেটা প্রচার করতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। সেই প্রচারণার কারণে যে উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল এবং তার কারণে যে কয়টি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল তার জন্যে সম্পাদক মহোদয়ের বুকের ভেতর কোনো অনুশোচনা হয়েছিল কি না সেটি আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।

সম্ভবত হয়নি—কারণ আমার দেশের সম্পাদক মহোদয়কে অত্যন্ত সঙ্গত কারণে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং এই দেশের পনেরটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদক প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মোটামুটি একই সময়ে প্রায় একই ধরনের কারণ দেখিয়ে চারজন ব্লগারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পনেরোজন সম্পাদক তখন একত্র হয়ে তাদের জন্যে মুখ ফুটে কোনো কথা বলেননি। ভাগ্যিস গোলাম আযম কিংবা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো যুদ্ধাপরাধীদের কোনো পত্রিকার সাথে সম্পর্ক নেই, যদি থাকত তাহলে এই পনেরোজন সম্পাদক হয়তো তাদের পক্ষেও বিবৃতি দিতেন। "আমার দেশ"-এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের তীব্র সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ প্রচারণার কারণে এই দেশে অনেক প্রাণ ঝরে গেছে, তিনি নিজের হাতে কোনো খুন হয়তো করেননি কিন্তু তার কারণে মানুষের প্রাণ বিপন্ন হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষের এ রকম একজন মানুষের জন্যে এই দেশের পনেরোজন সম্পাদক বিবৃতি দিতে পারেন, সেটি আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। ঘটনাটি আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে এবং আমি জানি এই দেশের তরুণ সমাজকে প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলোই যেহেতু এই দেশের মানুষের কাছে সব খবর পৌঁছে দেয় তাই নূতন প্রজন্মের ক্ষোভের কথাটি হয়তো দেশের মানুষ কোনো দিন জানতেও পারবে না।

যাই হোক, রাজনৈতিক মানুষের কাছে হয়তো আমরা নৈতিকতা আশা করা ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু ধার্মিক মানুষের কাছে তো আশা করতেই পারি। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ হেফাজতে ইসলামের নেতৃবৃন্দের মতো ইসলামের আলেম বা চিন্তাবিদ না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে আমাদের মতো মানুষেরা যে কোরান-হাদিস পড়তে পারে না তা নয়। (হেফাজতে ইসলামের ব্লগারের ওপর খুব রাগ কিন্তু তারা কী জানে ইসলামের ওপর খুব চমৎকার ব্লগ আছে?) ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থে তো খুব পরিষ্কারভাবে লেখা আছে কোনো মানুষকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া খুব বড় অপরাধ, পরকালে তার জন্যে খুব কঠোর শাস্তির কথা বলা আছে। তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর মতো কিংবা "আমার দেশ" পত্রিকার মতো হেফাজতে ইসলাম কেমন করে ঢালাওভাবে শাহবাগের সকল তরুণ-তরুণীকে নাস্তিক হিসেবে ঘোষণা দিতে পারল? মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ হলেই সে জামায়াতে ইসলামীর বিপক্ষের একজন মানুষ হবে, কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর বিপক্ষে হলেই সে ইসলামের বিপক্ষে হবে এই সরলীকরণ কবে থেকে শুরু হলো?

৩.

মে মাসের পাঁচ তারিখ হেফাজতে ইসলাম ঢাকা অবরোধের ডাক দিয়েছিল। তাদের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই কথাটি অনেকবার বলার পরও খালেদা জিয়া অবরোধের সাথে মিলিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টার একটা আলটিমেটাম দিলেন। হেফাজতে ইসলামের কর্মীদের কী পরিকল্পনা ছিল, তাদের সাথে বিএনপি বা জামায়াতের কী যোগযোগ ছিল আমরা কিছু জানি না কিন্তু মে মাসের পাঁচ তারিখ ভোর চারটার সময় আমি আমার ফোনে একটি এসএমএস পেলাম। ইংরেজি অক্ষরে বাংলায় লেখা এসএমএস আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি :

> "এই নাস্তিক জাফর ইকবাল, তোদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে। হতে পারে আজ রাতই তোদের শেষ রাত। কাল হয়তো তোরা আর পৃথিবীতে থাকতে পারবি না কারণ এই জমানার শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদিস আল্লামা আহমদ শফির ডাকে সারা বাংলাদেশের তৌহিদি জনতা মাঠে নেমে এসেছে। সেই সব তৌহিদি জনতা প্রধানমন্ত্রীসহ তোদের সব ধরে ধরে জবাই করে ছাড়বে। আমার আল্লাহকে নিয়ে, বিশ্বনবীকে নিয়ে, আলিমকে, নিয়ে কোরানের হাফেজদের নিয়ে কটূক্তি করার ভয়ংকর পরিণাম কী তা আগামীকালকেই হাড়ে হাড়ে টের পাবি তোরা।"

যে কোনো হিসেবে এটি একটি অত্যন্ত ভয়ংকর এসএমএস (এটি পাবার পর আমার সম্ভবত পুলিশকে জানানো উচিত ছিল কিন্তু এসব খবর সংবাদপত্রে চলে যায়, আপনজনেরা ভয় পায়, আমি তাই চেপে যাওয়ার চেষ্টা করি।) তবে এই এসএমএসটি পড়লে ৫ মে-এর ঘটনা সম্পর্কে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। সরকার যদিও এটাকে "শান্তিপূর্ণ" "নিয়মিতান্ত্রিক" অবরোধ এবং সমাবেশ ভেবে তাদের ঢাকা শহরে আসতে দিয়েছিল কিন্তু তাদের কর্মীদের অন্য পরিকল্পনা ছিল। হেফাজতে ইসলামের কর্মীদের তাদের নেতাদের ওপর অটল বিশ্বাস এবং তার নেতৃত্বে তারা আমাদের মতো মানুষদের জবাই করে ফেলাটাকে তাদের ইমানি দায়িত্ব হিসেবে মনে করে। মে মাসের ৫ তারিখে খালেদা জিয়া হেফাজতে ইসলামকে সব রকম সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে অসংখ্য লোক জমায়েত হয়ে পরদিন ঢাকা শহরে একটা চরম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে দেয়া হলে শেষ পর্যন্ত কী হতো আমরা জানি না।

সেদিন ঢাকা শহরে যে তাণ্ডব হয়েছিল দেশের মানুষ তা অনেক দিন মনে রাখবে। ইসলামকে হেফাজত করার দায়িত্ব নিয়ে একসাথে এত কোরান শরিফ সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও কখনো পোড়ানো হয়নি—এবং সম্ভবত আর কখনো হবেও না। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যদি কখনো কোরান শরিফের অবমাননা করা হয় বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভ শুরু হয়, এই প্রথমবার ইসলামপন্থী দলগুলো একেবারে নিঃশব্দে পবিত্র কোরান শরিফের এত বড় অবমাননাটি মেনে নিয়েছে, কেউ টুঁ শব্দটি করেনি। মে মাসের ৫ তারিখের মতো এত বড় নিষ্ঠুরতা এবং ধ্বংসযজ্ঞ আমরা আগে

কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারি না আর এর সব কিছু ঘটানো হয়েছে ইসলামকে রক্ষা করার নামে, এর থেকে বড় পরিহাস আর কী হতে পারে?

৪.

আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটছে সেখানে মন খারাপ হওয়ার মতো কিংবা হতাশ হওয়ার মতো অনেক কিছু ঘটছে কিন্তু তার পরেও আমি মন খারাপ করছি না কিংবা হতাশ হচ্ছি না শুধু একটি কারণে, সেটি হচ্ছে এখন আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি এই দেশে একটি অত্যন্ত দেশপ্রেমিক আধুনিক লেখাপড়া জানা তরুণ সমাজ আছে। দেশ যদি বিপদে পড়ে যায় তাহলে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে দেশের পাশে দাঁড়াতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। আমি একসময় ভাবতাম আমাদের সংবাদমাধ্যম এই দেশের একটি বড় শক্তি কিন্তু দেশের পনেরোজন সম্পাদকের সাম্প্রতিক কাজকর্ম দেখে আমার সেই ধারণায় চোট খেয়েছে। তারা অনেক জ্ঞানী-গুণী, বিচক্ষণ, যুক্তিবাদী, সচেতন এবং নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী। কিন্তু যেদিন আমি আবিষ্কার করেছি ন্যায় এবং অন্যায়ের মাঝখানেও কেউ কেউ নিরপেক্ষ হতে শুরু করেছেন সেদিন থেকে এই শব্দটিকে আমি সন্দেহ করতে শুরু করেছি।

ঠিক কী কারণ জানি না, জ্ঞানী-গুণী, বিচক্ষণ, যুক্তিবাদী, নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী থেকে কমবয়সী আবেগপ্রবণ যুক্তিহীন কিন্তু তীব্রভাবে দেশপ্রেমিক তরুণদের আমি বেশি বিশ্বাস করি, তাদের ওপর আমি অনেক বেশি ভরসা করি।

[জুলাই ১৭, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

আমার বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ

[যারা খবরের কাগজ লেখালেখি করেন, কার্টুন কিংবা কমিক স্ট্রিপ আঁকেন, পৃথিবীর সব দেশেই তাদের লেখালেখি, কার্টুন, কমিক একটি সিন্ডিকেটের ভেতর দিয়ে অনেক পত্রিকায় একসাথে ছাপা হয়। সে জন্য শুধু একটা নির্দিষ্ট পত্রিকার পাঠক নয়, সব পত্রিকার পাঠকেরাই সবার লেখা পড়তে পারেন। আমাদের দেশেও এটা হয় কিন্তু শুধুমাত্র বিদেশি লেখক বা শিল্পীদের জন্য। আমাদের নিজের দেশের লেখক বা শিল্পীদের কেন এই সুযোগটা দেওয়া হবে না সেটা আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলাম; সবাই বলেছেন, আমাদের দেশে এটা সম্ভব নয়, আমিও সেটা মেনে নিয়েছিলাম। কিছুদিন আগে আমার কী মনে হলো কে জানে, দেশের অনেক খবরের কাগজের সাথে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কী একদিনে সবাই একজনের লেখা ছাপতে রাজি আছেন। অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম সবাই রাজি। সেই এক্সপেরিমেন্টের ফসল আমার এই লেখা—তবে সে জন্যে আমার অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, কথা দিতে হয়েছে নিয়মিতভাবে লিখতে হবে, প্রতি দুই সপ্তাহে একবার। আমার মতো অলস মানুষের জন্যে সেটা অনেক বড় মূল্য! প্রথম লেখাটি বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে, আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে সে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে—তার কথা খুব মনে পড়ে।]

১.

হুমায়ূন আহমেদ আমার বড় ভাই, তাকে নিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিছু লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যেটাই লিখি তার মাঝে ব্যক্তিগত কথা চলে আসবে, আশা করছি পাঠকেরা সে জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

হুমায়ূন আহমেদ এই দেশের একজন বিখ্যাত মানুষ ছিল, বিখ্যাত মানুষেরা সব সময় দূরের মানুষ হয়, সাধারণ মানুষের কাছে তাদের পৌঁছানোর সুযোগ থাকে না। হুমায়ূন আহমেদ মনে হয় একমাত্র ব্যতিক্রম, কম বয়সী তরুণেরা তার বই থেকে বই পড়া শিখেছে, যুবকেরা বৃষ্টি আর জোছনাকে ভালোবাসতে শিখেছে। তরুণীরা অবলীলায় প্রেমে পড়তে শিখেছে, সাধারণ মানুষেরা তার নাটক দেখে কখনো হেসে ব্যাকুল কিংবা কেঁদে আকুল হয়েছে।

(হুমায়ূন আহমেদ কঠিন বুদ্ধিজীবীদেরও নিরাশ করেনি, সে কীভাবে অপ-সাহিত্য রচনা করে সাহিত্য জগৎকে দূষিত করে দিচ্ছে তাদের সেটা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছে।) হুমায়ূন আহমেদ শুধু বিখ্যাত হয়ে শেষ করে দেয়নি, সে অসম্ভব জনপ্রিয় একজন মানুষ ছিল। আমিও সেটা জানতাম কিন্তু তার জনপ্রিয়তা কত বিশাল ছিল সেটা আমি নিজেও কখনো কল্পনা করতে পারিনি। তার পরিমাপটা পেয়েছি সে চলে যাওয়ার পর (আমি জানি এটি এক ধরনের ছেলেমানুষি, কিন্তু মৃত্যু কথাটি কেন জানি বলতে পারি না, লিখতে পারি না।)

ছেলেবেলায় বাবা-মা আর ছয় ভাই-বোন নিয়ে আমাদের যে সংসারটা ছিল সেটি ছিল প্রায় রূপকথার একটি সংসার। একাত্তরে বাবাকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা মেরে ফেলার পর প্রথমবার আমরা সত্যিকারের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিলাম। সেই দুঃসময়ে আমার মা কীভাবে বুক আগলে আমাদের রক্ষা করেছিলেন সেটি এখনো আমার কাছে রহস্যের মতো। পুরো সময়টা আমরা রীতিমতো যুদ্ধ করে টিকে রইলাম, কেউ যদি সেই কাহিনীটুকু লিখে ফেলে সেটা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মতো হয়ে যাবে। তখন লেখাপড়া শেষ করার জন্যে প্রথমে আমি তারপর হুমায়ূন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছি। হুমায়ূন আহমেদ আগে, আমি তার অনেক পরে দেশে ফিরে এসেছি। হুমায়ূন আহমেদের আগেই সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত ছিল, ফিরে এসে সে যখন লেখালেখির পাশাপাশি টেলিভিশনের নাটক লেখা শুরু করল হঠাৎ করে তার জনপ্রিয়তা হয়ে গেল আকাশছোঁয়া। দেশে ফিরে এসে প্রথমবার বইমেলায় গিয়ে তার জনপ্রিয়তার একটা নমুনা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

এত দিনে আমাদের ভাই-বোনেরা বড় হয়েছে, সবারই নিজেদের সংসার হয়েছে। বাবা নেই, মা আছেন, সবাইকে নিয়ে আবার নূতন এক ধরনের পরিবার। হুমায়ূন আহমেদের হাতে টাকা আসছে, সে খরচও করছে সেভাবে। ভাই-বোন, তাদের স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে সে দিল্লি না হয় নেপাল চলে যাচ্ছে, ঈদের দিন সবাই মিলে হৈচৈ করছে—সব কিছু কেউ যদি গুছিয়ে লিখে ফেলে আবার সেটি একটি উপন্যাস হয়ে যাবে, একেবারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস।

একসময় আমাদের সেই হাসি-খুশি জীবনে আবার বিপর্যয় নেমে এলো। তিন মেয়ে আর এক ছেলেকে নিয়ে আমার ভাবি আর হুমায়ূন আহমেদের বিয়ে ভেঙে গেল। কেন ভেঙে গেল, কীভাবে ভেঙে গেল সেটি গোপন কোনো বিষয় নয়। দেশের সবাই সেটি জানে। আমি তখন একদিন হুমায়ূন আহমেদের সাথে দেখা করে তাকে বললাম,

"দেখো, তুমি তো এ দেশের একজন খুব বিখ্যাত মানুষ। তোমার যদি শরীর খারাপ হয় তাহলে দেশের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তোমাকে দেখতে চলে আসেন। তোমার তুলনায় ভাবি তার ছেলেমেয়ে নিয়ে খুব অসহায়—তার কেউ নেই। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি টিংকু ভাবির সাথে থাকি? তোমার তো আর আমার সাহায্যের দরকার নেই। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাবির হয়তো সাহায্যের দরকার।"

হুমায়ূন আহমেদ আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক আছে। তুই টিংকুর সাথে থাক।"

সেই থেকে আমরা টিংকু ভাবির সাথে ছিলাম। তার জন্যে সে রকম কিছু করতে পারিনি। শুধু হয়তো মানসিকভাবে পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ভাইয়ের স্ত্রী না হয়েও যেন আমাদের পরিবারের একজন হয়ে থাকতে পারে সবাই মিলে সেই চেষ্টা করেছি। খুব স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে হুমায়ূন আহমেদের সাথে একটা দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করেছিল। মায়ের কাছ থেকে তার খবর নিই, বেশিরভাগ সময় অবশ্য খবরের কাগজেই তার খবর পেয়ে যাই। সে অনেক বিখ্যাত, অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, তার জীবন অনেক বিচিত্র, সেই জীবনের কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে তার ওপর যে অভিমান হয়নি তা নয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেনে নিয়েছি। পরিবর্তিত জীবনে তার চারপাশে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী, তার অনেক বন্ধু, তার অনেক ক্ষমতা, তার এই নূতন জীবনে আমার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি।

গত বছর এ রকম সময়ে হঠাৎ করে মনে হলো এখন তার পাশে আমার থাকার প্রয়োজন। ক্যান্সারের চিকিৎসা করার জন্যে নিউ ইয়র্ক গিয়েছে, সব কিছু ভালোভাবে হয়েছে। শেষ অপারেশনটি করার আগে দেশ থেকে ঘুরে গেল, সুস্থ-সবল একজন মানুষ। যখন অপারেশন হয় প্রতি রাতে ফোন করে খোঁজ নিয়েছি, সফল অপারেশন করে ক্যান্সারমুক্ত সুস্থ একজন মানুষ বাসায় তার আপনজনের কাছে ফিরে গেছে। এখন শুধু দেশে ফিরে আসার অপেক্ষা। তারপর হঠাৎ করে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল, সার্জারি পরিবর্তিত অবিশ্বাস্য একটি জটিলতার কারণে তাকে আবার হাসপাতালে ফিরে যেতে হলো। আমি আর আমার স্ত্রী চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে নিউ ইয়র্ক হাজির হলাম। ব্রুকলিন নামের শহরে আমার ছেলেমেয়েরা আমাদের জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে রেখেছে। সেখানে জিনিসপত্র রেখে বেলভিউ হাসপাতালে ছুটে গেলাম। প্রকাশক মাযহার আমাদের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গেলেন, সেখানে তার স্ত্রী শাওনের সাথে দেখা হলো। উঁচু বিছানায় নানা ধরনের যন্ত্রপাতি হুমায়ূন আহমেদকে ঘিরে রেখেছে, তাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। অবস্থা একটু ভালো হলে তাকে জাগিয়ে তোলা হবে।

আমরা প্রতিদিন কাকডাকা ভোরে হাসপাতালে যাই, সারাদিন সেখানে অপেক্ষা করি, গভীর রাতে ব্রুকলিনে ফিরে আসি। হুমায়ূন আহমেদকে আর জাগিয়ে তোলা হয় না। আমি এত আশা করে দেশ থেকে ছুটে এসেছি, তার হাত ধরে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলব, অভিমানের যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল মুহূর্তে সেই দূরত্ব দূর হয়ে

যাবে কিন্তু সেই সুযোগটা পাই না। ইনটেনসিভ কেয়ারের ডাক্তারদের সাথে পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, এত দিনে তারা বিছানায় অসহায়ভাবে শুয়ে থাকা মানুষটির গুরুত্বের কথাও জেনে গেছে। তারা আমাকে বলল, "হুমায়ূন আহমেদ ঘুমিয়ে থাকলেও তারা তোমাদের কথা শুনতে পায়। তার সাথে কথা বলো।" তাই যখন আশপাশে কেউ থাকে না, তখন আমি তার সাথে কথা বলি। আমি তাকে বলি দেশের সব মানুষ, সব আপনজন তার ভালো হয়ে ওঠার জন্য দোয়া করছে। আমি তাকে মায়ের কথা বলি, ভাই-বোনের কথা বলি, ছেলে-মেয়ের কথা বলি। সে যখন ভালো হয়ে যাবে তখন তার এই চেতন-অচেতন রহস্যময় জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে কী অসাধারণ বই লিখতে পারবে তার কথা বলি। তার কাছে সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হলেও এটা যে স্বপ্ন নয় আমি তাকে মনে করিয়ে দিই, দেশ থেকে চলে এসে এখন আমি যে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছি এটা যে সত্যি, সেটা তাকে বিশ্বাস করতে বলি।

ঘুমন্ত হুমায়ূন আহমেদ আমার কথা শুনতে পারছে কি না সেটা জানার কোনো উপায় নেই, কিন্তু আমি বুঝতে পারি, সে শুনছে কারণ তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। আমি অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকি।

একদিন হুমায়ূন আহমেদের সবচেয়ে ছোট মেয়ে বিপাশা তার বাবাকে দেখতে এলো। যে কারণেই হোক বহুকাল তার বাবার কাছে যেতে পারেনি। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সে যখন গভীর মমতায় তার বাবার কপালে হাত রেখে তাকে ডাকল, কানের কাছে মুখ রেখে ফিসফিস করে কথা বলল, আমরা দেখলাম আবার তার দু'চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল। সৃষ্টিকর্তা আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন, মনে হয় সে জন্যেই এই দুঃখগুলো দিতেও কখনো কার্পণ্য করেননি।

১৯ জুলাই অন্যান্য দিনের মতো আমি হাসপাতালে গিয়েছি, ভোরবেলা হঠাৎ করে আমার মা আমাকে ফোন করলেন। ফোন ধরতেই আমার মা হাহাকার করে বললেন, "আমার খুব অস্থির লাগছে! কী হয়েছে বল।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হবে? কিছুই হয়নি। প্রত্যেক দিন যে রকম হাসপাতালে আসি, আজকেও এসেছি। সব কিছু অন্যদিনের মতো, কোনো পার্থক্য নেই।" আমার মায়ের অস্থিরতা তবুও যায় না, অনেক কষ্ট করে তাকে শান্ত করে ফোনটা রেখেছি। ঠিক সাথে সাথে আমার কাছে খবর এলো আমি যেন এই মুহূর্তে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যাই। হুমায়ূন আহমেদ মারা যাচ্ছে।" আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তথ্য কেমন করে পাঠানো সম্ভব তার সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমি জানি। কিন্তু পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠ থেকে একজন মা কেমন করে তার সন্তানের মৃত্যুক্ষণ নিজে থেকে বুঝে ফেলতে পারে আমার কাছে তার ব্যাখ্যা নেই।

আমি দ্রুত ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে গিয়েছি। হুমায়ূন আহমেদের কেবিনে সকল ডাক্তার ভিড় করেছে, তার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা ড. মিলারও আছেন। আমাদের দেখে অন্যদের বললেন, "আপনজনদের কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।"

আমি বুঝতে পারলাম হুমায়ূন আহমেদকে বাঁচিয়ে রাখার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন তাকে চলে যেতে দিতে হবে।

আমার স্ত্রী ইয়াসমিন আমাকে বলল আমার মাকে খবরটা দিতে হবে। ১৯৭১ সালে আমি আমার মাকে আমার বাবার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে তার সারাটা জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলাম। এত দিন পর আবার আমি নিষ্ঠুরের মতো তাকে তার সন্তানের আসন্ন মৃত্যুর কথা বলব? আমি অবুঝের মতো বললাম, আমি পারব না। ইয়াসমিন তখন সেই নিষ্ঠুর দায়িত্বটি পালন করল—মুহূর্তে দেশে আমার মা-ভাই-বোন, সব আপনজনের হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে সব স্বপ্ন, সব আশা এক ফুৎকারে নিভে গেল।

কেবিনের ভেতর উঁচু বিছানায় শুয়ে থাকা হুমায়ূন আহমেদকে অসংখ্য যন্ত্রপাতি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তার কাছে শাওন দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে ডেকে হুমায়ূন আহমেদকে পৃথিবীতে ধরে রাখতে চাইছে। আমরা বোধশক্তিহীন মানুষের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যে তরুণ ডাক্তার এত দিন প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছে সে বিষণ্ন গলায় আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করল, বলল, "আর খুব বেশি সময় নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ও কী কষ্ট পাচ্ছে?" তরুণ ডাক্তার বলল, "না কষ্ট পাচ্ছে না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কেমন করে জানো?" সে বলল, "আমরা জানি। তাকে আমরা যে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি তাতে তার কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এ রকম অবস্থা থেকে যখন কেউ ফিরে আসে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তার এখন কেমন লাগছে?" সে বলল, "স্বপ্ন দেখার মতো। পুরো বিষয়টা তার কাছে মনে হচ্ছে একটা স্বপ্নের মতো।"

একটু পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "যদি কোনো জাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ সে জ্ঞান ফিরে পায়, হঠাৎ সে বেঁচে ওঠে তাহলে কী সে আগের হুমায়ূন আহমেদ হয়ে বেঁচে থাকবে?" তরুণ ডাক্তার বলল, "এখন যদি জেগে ওঠে তাহলে হবে, একটু পরে আর হবে না। তার ব্লাড প্রেশার দ্রুত কমছে, তার মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ কমছে, মস্তিষ্কের নিউরন সেল ধীরে ধীরে মারা যেতে শুরু করছে।"

আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কম বয়সী তরুণী একজন নার্স তার মাথার কাছে সবগুলো যন্ত্রপাতির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হুমায়ূন আহমেদের জীবনের শেষ মুহূর্তটা যেন কষ্টহীন হয় তার নিশ্চয়তা দেওয়ার চেষ্টা করছে। চারপাশে ঘিরে থাকা যন্ত্রপাতিগুলো এত দিনে তাকে বাঁচিয়ে রেখে যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে, একটি একটি যন্ত্র দেখাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে তার জীবনের চিহ্নগুলো মুছে যেতে শুরু করেছে। ব্লাড প্রেশার যখন আরো কমে এসেছে আমি তখন তরুণ ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, "এখন? এখন যদি হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে ওঠে তাহলে কী হবে?" ডাক্তার মাথা নেড়ে বলল, "এখন যদি অলৌকিকভাবে তোমার ভাই জেগেও ওঠে সে আর আগের মানুষটি থাকবে না। তার মস্তিষ্কের এরই মধ্যে অনেক নিউরন সেল মারা গেছে।"

আমি নিঃশব্দে হুমায়ূন আহমেদকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় জানালাম। তার দেহটিতে এখনো জীবনের চিহ্ন আছে কিন্তু আমার সামনে যে মানুষটি শুয়ে আছে সে আর অসম্ভব সৃষ্টিশীল অসাধারণ প্রতিভাবান হুমায়ূন আহমেদ নয়। যে মস্তিষ্কটা তাকে অসম্ভব একজন সৃষ্টিশীল মানুষ করে রেখেছিল, তার কাছে সেই মস্তিষ্কটা আর নেই। সেটি হারিয়ে গেছে।

তরুণ ডাক্তার একটু পর ফিসফিস করে বলল, "এখন তার হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত হতে থাকবে।" সত্যি সত্যি তার হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত হতে থাকল। ডাক্তার একটু পরে বলল, "আর মাত্র কয়েক মিনিট।"

আমি বোধশক্তিহীন মানুষের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম, এবারে একটু কাছে গিয়ে তাকে ধরে রাখলাম। যে যন্ত্রটিতে এত দিন তার হৃৎস্পন্দন স্পন্দিত হয়ে এসেছে, এটা শেষবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চিরদিনের মতো থেমে গেল। মনিটরে শুধু একটি সরল রেখা, আশ্চর্য রকম নিষ্ঠুর একটি সরলরেখা। হুমায়ূন আহমেদের দেহটা আমি ধরে রেখেছি কিন্তু মানুষটি চলে গেছে।

ছোট একটি ঘরের ভেতর কী অচিন্তনীয় বেদনা এসে জমা হতে পারে আমি হতবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

২.

আমি আর ইয়াসমিন ঢাকা ফিরেছি বাইশ তারিখ ভোরে। এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার আগেই অসংখ্য টেলিভিশন ক্যামেরা আমাদের ঘিরে ধরল, আমি নূতন করে বুঝতে পারলাম হুমায়ূন আহমেদের জন্য শুধু তার আপনজন নয় পুরো দেশ শোকাহত।

এর পরের কয়েক দিনের ঘটনা আমি যেটুকু জানি এই দেশের মানুষ তার থেকে অনেক ভালো করে জানে। একজন লেখকের জন্য একটা জাতি এভাবে ব্যাকুল হতে পারে আমি নিজের চোখে না দেখলে কখনো বিশ্বাস করতাম না। কোথায় কবর দেওয়া হবে সে বিষয়টা শুধু আপনজনদের বিষয় থাকল না, হঠাৎ করে সেটা সারা দেশের সব মানুষের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। টেলিভিশনের সব চ্যানেল একান্তই একটা পারিবারিক বিষয় চব্বিশ ঘণ্টা দেখিয়ে গেছে এত দিন পরও আমার সেটা বিশ্বাস হয় না। পরে আমি অনেককে প্রশ্ন করে বুঝতে পেরেছি এটা কী একটা স্বাভাবিক বিষয় নাকি মিডিয়াদের তৈরি করা একটা কৃত্রিম "হাইপ"। সবাই বলেছে এটি "হাইপ" ছিল না, দেশের সব মানুষ সারা দিন সারা রাত নিজের আগ্রহে টেলিভিশনের সামনে বসে ছিল। একজন লেখকের জন্য এত তীব্র ভালোবাসা মনে হয় শুধু এই দেশের মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

৩.

হুমায়ূন আহমেদ কি শুধু জনপ্রিয় লেখক নাকি তার লেখালেখির সাহিত্য মর্যাদাও আছে, সেটি বিদগ্ধ মানুষের একটি প্রিয় আলোচনার বিষয়। আমি সেটি নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। কারো কাছে মনে হতে পারে দশ প্রজন্মের এক হাজার লোক একটি সাহিত্যকর্ম উপভোগ করলে সেটি সফল সাহিত্য! আবার কেউ মনে করতেই পারে তার দশ প্রজন্মের পাঠকের প্রয়োজন নেই, এক প্রজন্মের এক হাজার মানুষ পড়লেই সে সফল। কার ধারণা সঠিক সেটি কে বলবে? আমি নিজে যেহেতু অল্পবিস্তর লেখালেখি করি তাই আমি জানি একজন লেখক কখনোই সাহিত্য সমালোচকের মন জয় করার জন্য লেখেন না, তাঁরা লেখেন মনের আনন্দে। যদি পাঠকেরা সেই লেখা গ্রহণ করে সেটি বাড়তি পাওয়া। হুমায়ূন আহমেদের লেখা শুধু যে পাঠকেরা গ্রহণ করেছিল তা নয়, তার লেখা কয়েক প্রজন্মের পাঠক তৈরি করেছিল। বড় বড় সাহিত্য সমালোচকেরা তার লেখাকে আড়ালে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন কিন্তু ঈদ সংখ্যার আগে একটি লেখার জন্য তার পেছনে ঘুরঘুর করেছেন, সেটি আমাদের সবার জন্যে একটি বড় কৌতুকের বিষয় ছিল। কয়েক দিন আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনী সংস্থার কর্ণধারের সাথে কথা হচ্ছে, কথার ফাঁকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের কাছে কি হুমায়ূন আহমেদের কোনো বই আছে?"

প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোকের মুখটি কেমন যেন ম্লান হয়ে গেল। দুর্বল গলায় বললেন, হুমায়ূন আহমেদ যখন প্রথম লিখতে শুরু করেছে তখন সে তার একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাদের প্রকাশনীতে এসেছিল। তাদের প্রকাশনীতে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী মানুষ নিয়ে রিভিউ কমিটি ছিল, পাণ্ডুলিপি পড়ে রিভিউ কমিটি সুপারিশ করলেই শুধুমাত্র বইটি ছাপা হতো। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসটি পড়ে রিভিউ কমিটি সেটাকে ছাপানোর অযোগ্য বলে বাতিল করে দিল। প্রকাশনীটি তাই সেই পাণ্ডুলিপি না ছাপিয়ে হুমায়ূন আহমেদকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনীটির কর্ণধারের মুখ দেখে আমি টের পেয়েছিলাম তিনি তার প্রকাশনীর রিভিউ কমিটির সেই জ্ঞানী-গুণী সদস্যদের কোনো দিন ক্ষমা করেননি। করার কথা নয়।

হুমায়ূন আহমেদ তিন শতাধিক বই লিখেছে, তার ওপরেও গত বছরে সম্ভবত প্রায় সমানসংখ্যক বই লেখা হয়েছে। কত বিচিত্র সেই বইয়ের বিষয়বস্তু। তার জন্যে গভীর ভালোবাসা থেকে লেখা বই যে রকম আছে, ঠিক সে রকম শুধুমাত্র টু-পাইস কামাই করার জন্যে লেখা বইয়েরও অভাব নেই। লেখক হিসেবে আমাদের পরিবারের কারো নাম দিয়ে গোপনে বই প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে, শেষ মুহূর্তেও থামানো হয়েছে এ রকম ঘটনাও জানি। হুমায়ূন আহমেদ চলে যাওয়ার পর মানুষের তীব্র ভালোবাসার কারণে ইন্টারনেটে নানা ধরনের আবেগের ছড়াছড়ি ছিল, সে কারণে মানুষজন গ্রেফতার পর্যন্তও হয়েছে। হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে ছাড়াও পেয়েছে। তার মৃত্যু নিয়ে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা আছে, কাজেই কোনো কোনো বই যে বিতর্ক জন্ম দেবে

তাতেও অবাক হওয়ার কিছুই নেই। তাই আমি যখন দেখি কোনো কোনো বইয়ের বিরুদ্ধে জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা বিবৃতি দিচ্ছেন, সেই বই নিষিদ্ধ করার জন্যে মামলা-মোকদ্দমা হচ্ছে, আমি একটুও অবাক হই না। শুধু মাঝে মাঝে ভাবি, হুমায়ূন আহমেদ যদি বেঁচে থাকত তাহলে এই বিচিত্র কর্মকাণ্ড দেখে তার কী প্রতিক্রিয়া হতো?

কেউ যেন মনে না করে তাকে নিয়ে শুধু রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ কিংবা ব্যবসা হচ্ছে, আমাদের চোখের আড়ালে তার জন্যে গভীর ভালোবাসার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জগৎ রয়েছে। আমি আর আমার স্ত্রী ইয়াসমিন যখন হুমায়ূন আহমেদের পাশে থাকার জন্যে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলাম তখন একজন ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়েছিল। সে হুমায়ূন আহমেদের সেবা করার জন্য তার কেবিনে বসে থাকত। শেষ কয়েক সপ্তাহ যখন তাকে অচেতন করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হলো তখনো ওই ছেলেটি সারা রাত হাসপাতালে থাকত। হুমায়ূন আহমেদ যখন আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখনো সে আমাদের সাথে ছিল। সেই দিন রাতে এক ধরনের ঘোরলাগা অবস্থায় আমরা যখন নিউ ইয়র্ক শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখনো এই ছেলেটি নিঃশব্দে আমাদের সাথে হেঁটে হেঁটে গেছে।

দেশে ফিরে এসে মাঝে মাঝে তার সাথে যোগাযোগ হয়। শেষবার যখন তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে সে বলেছে এখনো মাঝে মাঝে সে বেলভিউ হাসপাতালে গিয়ে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে বসে থাকে।

কেন বসে থাকে আমি জানি না। আমার ধারণা সে নিজেও জানে না। শুধু এইটুকু জানি এই ধরনের অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা নিয়ে হুমায়ূন আহমেদ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

মনে হয়, এই ভালোবাসাটুকুই হচ্ছে জীবন।

[জুলাই ১৯, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

গ্লানিমুক্ত বাংলাদেশ

গত সোমবার যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের রায় হওয়ার পর পুরো দেশে আশাভঙ্গের একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা গেছে। তরুণ প্রজন্মের প্রতিক্রিয়াটি ছিল সবচেয়ে তীব্র। প্রথমে ক্রোধ তারপর ক্ষোভ আর দুঃখ এবং সবশেষে হতাশা। আমার সাথে পরিচয় আছে এ রকম অনেকের সাথে ফোনে কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দিতে হয়েছে, উৎসাহ দিতে হয়েছে।

বিচারের রায় নিয়ে হতাশার কারণ কি? গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের যে অভিযোগগুলো আনা হয়েছে তার প্রত্যেকটা প্রমাণিত হয়েছে। সম্মানিত বিচারকরা পরিষ্কার করে বলেছেন সর্বোচ্চ শাস্তিটিই তার প্রাপ্য ছিল, শুধু বয়সের কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে নব্বই বছরের জেল দেওয়া হয়েছে। একানব্বই বছরের একজন যুদ্ধাপরাধীর পরবর্তী নব্বই বছর জেলে থাকা মৃত্যুদণ্ড থেকে কোনো অংশেই কম নয়, তাহলে কেন আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্ম এত হতাশ? কেন তাদের মনে হচ্ছে তারা ন্যায়বিচার পায়নি?

কারণটি খুব সহজ। বাংলাদেশের ইতিহাসের যা কিছু অশুভ তার প্রতীক হচ্ছে গোলাম আযম। স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দেশের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যে মানুষটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী তৈরি করে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে এই দেশের মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আর প্ররোচণা করেছে যে শক্তি, তার নাম গোলাম আযম। মুক্তিযুদ্ধের শেষে পরাজয় আসন্ন জেনে পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়া, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এই নতুন দেশটির বিরুদ্ধে প্রচারণা করা, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে দেশের পট পরিবর্তন হওয়ার পর দেশে পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে ফিরে আসা, কূটকৌশলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে আবার জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব দেওয়া—এর কোনোটিই তো এ দেশের মানুষের অজানা নয়। পৃথিবীর বড় পাঁচটি গণহত্যার মধ্যে একটিতে নেতৃত্ব

দিয়েও তার জন্যে বুকের ভেতর কোনো দুঃখ নেই, অনুতাপ নেই। বরং সদম্ভে "একাত্তরে কোনো ভুল করিনি" বলে নূতন একটি প্রজন্মকে বাংলাদেশের আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো, মুক্তিযুদ্ধকে ঘৃণা করে, সাম্প্রদায়িকতাকে গ্রহণ করে ষড়যন্ত্র করতে শেখানো—এর সব কিছুর মূলে গোলাম আযম। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সকল অশুভ শক্তির প্রতীক হচ্ছে গোলাম আযম, এই দেশের শিশুরা যখন একটি রাজাকারের ছবি আঁকার চেষ্টা করে, তারা যে মানুষটির চেহারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, সেই মানুষটি হচ্ছে গোলাম আযম। তাই এই দেশের মানুষের আশা ছিল দেশের বিরুদ্ধে থাকা সবচেয়ে বড় যুদ্ধাপরাধীর শাস্তিটাও হবে সর্বোচ্চ শাস্তি।

সেটি হয়নি। এই তরুণ প্রজন্মের মন খারাপ কারণ তারা ইতিহাসের খাতায় লিখিয়ে যেতে পারল না। এই দেশে সবচেয়ে বড় যুদ্ধাপরাধীকে সবচেয়ে বড় শাস্তিটা পেতে হয়েছে। তাদের মন খারাপ তো হতেই পারে।

আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি দেশের সব তরুণের কাছে গিয়ে বলতাম, তোমরা মন খারাপ কোরো না, হতাশ হয়ো না, আমরা যারা একাত্তরের ভেতর দিয়ে এসেছি, তারা জানি তখন কী ভয়ংকর একটা পরিবেশ ছিল কিন্তু তারপরে এই দেশের মানুষ হতাশ হয়নি। তারা হতাশ হয়নি বলেই আমরা আমাদের দেশ পেয়েছি—একাত্তরের এই শিক্ষাটা সবাইকে নিতে হবে। রাগ হতে পারে, দুঃখ কিংবা ক্ষোভ হতে পারে কিন্তু হতাশ হওয়া যাবে না। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের বীর মুক্তিযোদ্ধারা যেটাকে নূতন করে উজ্জীবিত করেছেন, সেটি শুরু হয়েছে শুধু তরুণ প্রজন্মের কারণে। তারা তীব্রভাবে এটা চেয়েছিল বলে চল্লিশ বছর পরে হলেও আমরা গ্লানিমুক্ত হতে চলেছি। তরুণ প্রজন্ম যদি তীব্রভাবে চায়, তাহলে এই দেশে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতিও নিষিদ্ধ হবে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প চিরদিনের জন্যে মুছে যাবে। তারা যদি চায় তাহলে হেফাজতে ইসলামের মতো সংগঠনগুলোর তীব্র নারীবিদ্বেষ থাকার পরও এই দেশের নারী-পুরুষ পাশাপাশি দেশটাকে গড়ে তুলতে পারবে। শুধু তাদের এটা চাইতে হবে। আমি জানি তাদের ভেতর আরো একটা দুর্ভাবনা কাজ করছে। সেটি হচ্ছে, সরকার পরিবর্তন হলে কী যুদ্ধাপরাধীরা শাস্তি না পেয়েই বের হয়ে আসবে? বিষয়টি এত সহজ নয়, সবচেয়ে বড় কথা, এই সরকারের তিন-চতুর্থাংশ মেজরিটি নিয়ে তারা তো সংবিধানে একটা সংশোধনী করে যেতেই পারে, ভবিষ্যতে কোনোভাবেই যেন যুদ্ধাপরাধীরা মুক্ত হতে না পারে। হয়তো এখন আমাদের সেটাও দাবি করতে হবে।

যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার প্রক্রিয়াটি আমি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করেছি। এই দেশের বিরুদ্ধে তার অবস্থানটি গোপন কিছু নয়, সেটি নিয়ে কোনো অনুতাপ নেই, দোষ স্বীকার করা নেই, দুঃখ নেই, ক্ষমা ভিক্ষা নেই, তাহলে কেন মাথা উঁচু করে পাকিস্তানের জন্য আনুগত্যের কথা স্বীকার করে সত্যটি প্রকাশ করে দেওয়া হয় না। কেন মিথ্যাচার করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে ট্রাইব্যুনালের সামনে মাথা নিচু করে শাস্তি গ্রহণ করতে হয়।

আমার তখন রাজশাহীর রোহনপুরের সেই তরুণ মুক্তিযোদ্ধার কথা মনে পড়ে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারের লেখা বইয়ে উল্লেখ আছে, একাত্তরের জুন মাসে সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পর যখন তার বুকে অস্ত্র ধরে তাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে সে তখন গোলাম আযমের মতো মিথ্যাচার করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। নিচু হয়ে মাতৃভূমির মাটিকে শেষবার চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, আমার রক্ত আমার প্রিয় দেশটাকে স্বাধীন করবে।

এত রক্তে পাওয়া এই দেশ, এই দেশকে যুদ্ধাপরাধের গ্লানি থেকে মুক্ত করতেই হবে। একাত্তরে তরুণেরা করেছিল, এখন আবার তরুণদেরই করতে হবে।

[জুলাই ১৭, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

গাড়ির চতুর্থ চাকা

[গত মে মাসের ১০ তারিখ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আমাকে সমাবর্তন-বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি তখন অনেক চিন্তা-ভাবনা করে একটা বক্তব্য দাঁড়া করিয়েছিলাম। বক্তব্যটি যদিও একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা নির্দিষ্ট বয়সের তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশে তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু সেখানে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম, আমার খুব ইচ্ছে সেই কথাগুলো আমি অন্যদেরও বলি। আমার মনে হয় 'সাদাসিধে কথা'র এই জায়গাটুকু সে কাজটি করার জন্যে খুব বড় একটা সুযোগ। আমি সুযোগটা গ্রহণ করছি, পাঠকেরা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।]

আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা

আজকের দিনটি তোমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর একটি—একই সাথে এটি সবচেয়ে আনন্দেরও একটি দিন। আমার অনেক বড় সৌভাগ্য যে তোমাদের এই আনন্দের দিনটিতে আমি তোমাদের সাথে কিছু সময় কাটাতে পারছি। আমাকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্যে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

তোমরা যে রকম তোমাদের জীবনের প্রথম সমাবর্তনে এসেছ, আমিও ঠিক সে রকম আমার জীবনের প্রথম সমাবর্তন বক্তা হিসেবে এসেছি। সমাবর্তন নিয়ে তোমাদের মনের ভেতর যে রকম আগ্রহ এবং উদ্দীপনা তোমাদের সামনে কয়েকটি কথা বলার জন্যে আমার ভেতরেও ঠিক একই আগ্রহ ও উদ্দীপনা।

তোমাদেরকে আমি কোনো উপদেশ দেব না, তোমাদের কোনো নীতিকথাও শোনাব না, আমি তোমাদের হয়তো কয়েকটি কথা স্মরণ করিয়ে দেব। তার পাশাপাশি

আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে যে কয়টি সত্য উপলব্ধি করেছি, তোমাদেরকে সেই কথাগুলো বলার চেষ্টা করব। কয়েক যুগ পর তোমরা হয়তো নিজেরাই এই সত্যগুলো উপলব্ধি করতে, আমি মাঝখানের সেই দীর্ঘ সময়টুকু শর্টসার্কিট করে দিচ্ছি মাত্র—তার বেশি কিছু নয়।

তোমরা একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে জীবনের পরের ধাপে পা দিতে যাচ্ছ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চলে আসার কারণে দেশের সবাই এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়ায় কত খরচ হয় তার একটা ধারণা পেয়ে গেছ। সেই তুলনাটি থেকে তোমাদের ধারণা হতে পারে তোমরা বুঝি খুব অল্প খরচে একটা ডিগ্রি পেয়েছ—সেটি কিন্তু সত্যি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেটকে তোমাদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে তোমাদের লেখাপড়ার খরচটুকু বের হয়ে আসবে এবং আমি বাজি ধরে বলতে পারি সেই পরিমাণটুকু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ থেকে কোনো অংশে কম নয়—বরং বেশি হলে আমি অবাক হব না। তোমাদের পেছনে এই খরচটুকু করেছে সরকার। সরকার এই অর্থটুকু কার কাছ থেকে পেয়েছে? পেয়েছে এই দেশের চাষিদের কাছ থেকে, শ্রমিকদের কাছ থেকে, খেটে খাওয়া মানুষদের কাছ থেকে। আমি তোমাদের শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই, এই দেশের অনেক দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ হয়তো তার নিজের সন্তানকে স্কুল-কলেজ শেষ করিয়ে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পাঠাতে পারেনি, কিন্তু তার হাড়ভাঙা খাটুনির অর্থ দিয়ে তোমাদের লেখাপড়া করিয়েছে। এখন তোমরাই ঠিক করো তোমার এই শিক্ষাটুকু দিয়ে তুমি কার জন্যে কী করবে!

কিছু দিন আগে খবরের কাগজের একটি প্রতিবেদন চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে একটি সত্য নূতন করে জানিয়ে দিয়েছে। সত্যটি হলো, আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে এসেছে, আর এই এগিয়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে দেশের তিন ধরনের মানুষ। গার্মেন্টসের শ্রমিকরা—যার বেশিরভাগই হচ্ছে মেয়ে—অর্ধসহস্রাধিক (তখনো আমি জানতাম না সংখ্যাটি সহস্রাধিক হয়ে যাবে) সেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের আমরা সাভারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছি। প্রবাসী শ্রমিক—যারা নিজের আপনজনকে দেশে ফেলে নির্বান্ধব পরিবেশে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবং এই দেশের কৃষক যাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্যে আমরা আমাদের ভাষায় *চাষা* নামক একটা শব্দ তৈরি করে রেখেছি। আমি রীতিমতো ধাক্কা খেয়েছি যখন আবিষ্কার করেছি—যারা এই দেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে আমি তাদের কেউ নই, তাদের কারো সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই—আমি তাদের জন্যে কখনো কিছু করিনি। আমার মনে হয়েছে আমি বুঝি এই দেশের বোঝা, এই দেশের গার্মেন্টসের মেয়েরা, প্রবাসী শ্রমিকরা আর মাঠ-ঘাটের চাষিরা আমার সুন্দর একটা জীবন উপহার দিয়েছে—প্রতিদানে আমি তাদের কিছু দিইনি।

আমি তখন নিজেকে বুঝিয়েছি, দেশের অর্থনীতিকে এখন গার্মেন্টসের মেয়েরা, প্রবাসী শ্রমিক এবং চাষিরা সচল রেখেছে, তারা একটি গাড়ির তিনটি চাকার মতো—

গাড়িটি সত্যিকারভাবে ছুটতে পারবে যখন তার সাথে চতুর্থ চাকাটি জুড়ে দেওয়া হবে। সেই চতুর্থ চাকা কোনটি? তোমরা হচ্ছ সেই চতুর্থ চাকা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে বলীয়ান আমাদের নূতন প্রজন্ম। আমি বুভুক্ষুর মতো অপেক্ষা করে আছি তোমাদের মেধা-মনন ও সৃজনশীলতা নিয়ে কখন তোমরা এই দেশের শ্রমজীবী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে। কখন মানুষের শরীরের ঘাম অপসারিত হবে মস্তিষ্কের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।

তোমরা কি জানো, এটি তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়? তোমরা কি জানো, তোমাদের চোখে রয়েছে রঙিন চশমা, আমাদের চোখে যেটি একেবারেই সাদামাটা তোমাদের চোখে সেটিই বিচিত্র বর্ণে উজ্জ্বল? তোমরা কি জানো এখন তোমাদের জীবনকে উপভোগ করার সময়?

তোমরা কি জানো জীবনকে কীভাবে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করা যায়? তোমাদের সবারই নিশ্চয়ই এই বিষয়ে নিজের একটা ভাবনা আছে—আমি তোমাদের সাথে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া আমার ভাবনাটুকু বিনিময় করি। নিজের জন্যে যখন কিছু একটা করি তখন অবশ্যই আমাদের এক ধরনের আনন্দ হয় কিন্তু তার থেকে শতগুণ বেশি আনন্দ হয় যখন আমরা অন্যের জন্যে কিছু করি! তোমাদের ভেতর যারা বন্যাপীড়িত মানুষের কাছে গিয়ে তাদের হাতে একটুখানি ত্রাণ তুলে দিয়েছ তখন তাদের মুখে যে হাসিটুকু দেখেছ আমি জানি সেটি তুমি কখনো ভুলবে না। তুমি যখন রক্ত দিয়েছ সেই রক্তের ব্যাগ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত গিয়ে যখন একজন মুমূর্ষু বিবর্ণ রোগীর মুখে জীবনের স্পন্দন দিয়ে এসেছে, আমি জানি তুমি সেই আনন্দের কথা কখনো ভুলতে পারবে না। তুমি যখন তোমার ক্যাম্পাসের পথে-ঘাটে পাতা কুড়ানো হতদরিদ্র শিশুটিকে বারান্দায় বসিয়ে বর্ণ পরিচয় করিয়েছ তুমি নিশ্চয়ই সেই আনন্দটির কথাও কখনো ভুলতে পারোনি। যখন গণিত অলিম্পিয়াডে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের সাহায্য করেছ তখন তাদের উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিটি নিশ্চয়ই তুমি ভুলতে পারোনি। যারা এখনো সেই তীব্র আনন্দের স্বাদ উপভোগ করোনি তাদের আমি মনে করিয়ে দিতে চাই—জীবনটিকে একেবারে কানায় কানায় উপভোগ করার এখনই সময়। অন্যের জন্যে কিছু করে জীবন উপভোগ করার এই পথটুকুর সন্ধান পেতে পেতে আমার অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছিল—আমি কিন্তু তোমাদের অনেক আগেই বলে দিয়েছি!

আমার এই দীর্ঘ জীবনে আমি অনেক মানুষকে দেখেছি, অনেকের সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে, সবাইকে নিয়ে আমি অনেক কিছু করেছি। আমার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি খুব সোজাসাপ্টা একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি; সেটি হচ্ছে পৃথিবীর মানুষ দুই রকম! এক ধরনের মানুষের সব কিছুতে উৎসাহ, সব সময়েই তারা নূতন কিছু করার জন্যে ব্যস্ত। সব সময়েই তারা কিছু না কিছু করছে, একশটা জিনিস করতে গিয়ে তারা অনেক সময়েই ঘোট পাকিয়ে ফেলছে, সমস্যায় পড়ে যাচ্ছে—তারপরেও তাদের উৎসাহে কোনো অভাব নেই। অন্য ধরনের মানুষের কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই, তারা নিস্পৃহ, তাদের তাপ উত্তাপ নেই। তারা নূতন কিছু করে না, তাই তাদের জীবনে ভুলও হয় না। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে উত্তেজনা নেই, উচ্ছ্বাস নেই।

আমি তোমাদের আরো একটি সত্যের সন্ধান দিয়ে যাই—এই পৃথিবী, দেশ কিংবা সমাজটাকে চলায় প্রথম গোষ্ঠী যাদের সব কিছুতে উৎসাহ! পৃথিবীর যত বড় কাজ সব করেছে এই উৎসাহী প্রজন্ম। তোমাদের ভেতর যারা এই উৎসাহীদের দলে আমি জানি তোমাদের অতি-উৎসাহের কারণে অনেক সময় তোমার ক্ষতি হয়েছে, অনেক গুরুজন তোমাকে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে নিষেধ করেছেন, ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তোমরা অনেকবার বিপদে পড়েছ। আমি তোমাদের আশ্বস্ত করতে চাই, দেখবে তোমরাই কিন্তু সব কিছুতে নেতৃত্ব দেবে, তোমার অঙ্গুলি হেলেনে সবাই তোমার পেছনে এসে দাঁড়াবে। তোমাদের ভেতর যারা উৎসাহকে রাশ টেনে নামিয়ে সতর্কভাবে পা ফেলেছে, উৎসাহী বন্ধুদের একশ রকম কাজ দেখে বিরক্ত হচ্ছে, সমালোচনা করেছে তাদেরকে বলে রাখি, এই উৎসাহটুকুই কিন্তু সফল আর অসফল মানুষের মাঝখানে বিভাজন। তোমরা ঠিক করো মাপা উৎসাহ নিয়ে বিভাজনের নিচে দাঁড়াবে নাকি তীব্র উৎসাহের বান ডাকিয়ে বিভাজনের ওপরে গিয়ে দাঁড়াবে।

আজ তোমাদের একটি ছাত্রজীবনের সমাপ্তি হয়েছে। তোমার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তোমাদেরকে অসংখ্যবার পরীক্ষা দিতে হয়েছে, সেই পরীক্ষায় তুমি তোমার সহপাঠীর সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছ, সেই প্রতিযোগিতায় তোমরা কেউ কেউ তোমাদের সহপাঠীদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছ। আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, সত্যিকারের জীবন কিন্তু প্রতিযোগিতার জীবন নয়। সেখানে কিন্তু কাউকে ঠেলে পেছনে ফেলে তোমায় এগিয়ে যেতে হবে না। সত্যিকারের জীবন হচ্ছে সহযোগিতার। সত্যিকার জীবনে তুমি যখন সত্যিকারের কাজ করবে তখন তোমরা একে অন্যের সাথে পাশাপাশি থেকে সাহায্য করবে। সেখানে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। প্রতিযোগিতা শুধু একটি জায়গায় থাকে—সেটি হচ্ছে নিজের সাথে প্রতিযোগিতা। তুমি এখন যা, দেখি তুমি এক বছর পর সেখান থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারো কি না।

তোমরা এই দেশের নূতন একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে যাচ্ছ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মশালটি এখন তোমাদের হাতে। তোমরা কর্মজীবনে কী করো, তার ওপর নির্ভর করবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম। তাই তোমাদের আকাশছোঁয়া স্বপ্ন দেখতে হবে, বড় স্বপ্ন না দেখলে বড় কিছু অর্জন করা যায় না!

এই দেশটি তরুণদের দেশ। বায়ান্ন সালে তরুণেরা এই দেশে মাতৃভাষার জন্যে আন্দোলন করেছে, রক্ত দিয়েছে, একাত্তরে সেই তরুণরাই মাতৃভূমির জন্যে যুদ্ধ করেছে, অকাতরে রক্ত দিয়েছে। আমাদের দেশটি এখন যখন পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে যাচ্ছে আবার সেই তরুণেরাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে। তোমরা সেই তরুণদের প্রতিনিধি—তোমাদের দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই, আমি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি।

তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা—ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার জন্যে আমাকে নূতন একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে!

[আগস্ট ০২, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

মিথ্যা বলার অধিকার

গত কিছুদিনে আমি একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি। একটি দেশের মানুষের যে রকম খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার অধিকার থাকে, আমাদের দেশে তার সাথে একটা নূতন বিষয় যোগ হতে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে মিথ্যা কথা বলার অধিকার। এই দেশের মানুষ যেন চাইলেই মিথ্যা কথা বলতে পারে এবং সেই মিথ্যা কথা বলার জন্যে দেশে অন্য কারো যত বড় সর্বনাশই হোক না কেন যিনি মিথ্যা কথা বলছেন তিনি যেন নিরাপদে মিথ্যা বলতে পারেন সে জন্যে এই দেশের পত্র-পত্রিকা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, জ্ঞানী-গুণী মানুষজন সবাই একত্র হয়ে গেছেন। কেউ যেন মনে না করে আমি বাড়িয়ে-চাড়িয়ে বলছি, সে জন্যে আমি জলজ্যান্ত কয়েকটি উদাহরণ দেই।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঘটনা থেকে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা নিয়োগ নিয়ে এই দেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় একদিন একটা খবর ছাপা হলো। সংবাদটি মিথ্যা—এটাকে মিথ্যা বলা হবে না কী অসত্য বলা হবে, নাকি অর্ধসত্য বলা হবে সেসব নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। আমি সেই তর্কে যাচ্ছি না, যেখানে সঠিক তথ্য রয়েছে সেখানে সেই তথ্যটাকে আড়ালে রেখে অন্য কিছু ইচ্ছে করে বলা হলে আমি সেটাকে মিথ্যা বলে বিবেচনা করি। যাই হোক, সেই মিথ্যা সংবাদটির কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু অধ্যাপকের চরিত্রে মিথ্যা গ্লানি স্পর্শ করল। তারা খুব আহত হলেন। ঘটনাক্রমে সেই সাংবাদিক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কোনো ছাত্র শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেওয়ার নিয়ম আছে, পরে পুরো তদন্ত করে অপরাধ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হয়। কাজেই সেই ছাত্রটির মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের প্রাথমিক তদন্ত করে তাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে একটা তদন্ত কমিটি করে দেওয়া হলো এবং আমি সেই তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক। আমি বিষয়টি জোর দিয়ে লিখতে পারছি কারণ তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে আমি খুঁটিনাটি সব কিছু জানি।

ছাত্রদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজস্ব কিছু অলিখিত নিয়ম আছে, কমবয়সী ছেলেমেয়েরা দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে সব সময়েই তাদের শাস্তি কমিয়ে দেওয়া হয়, সব সময়েই চেষ্টা করা হয় তাদের লেখাপড়ার যেন ক্ষতি না হয়। (একেবারে খুন-ধর্ষণ করে পলাতক হয়ে গেলে অন্য কথা—তখন অপরাধটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, দেশের আইনের) আমি তদন্ত করতে গিয়ে অত্যন্ত বিচিত্র একটি বিষয় আবিষ্কার করলাম, ছাত্র সাংবাদিকটিকে সেই সংবাদপত্র পুরোপুরিভাবে নিরাপত্তা দিয়ে গেল, সে কারণে তার ঔদ্ধত্য হলো সীমাহীন, শুধু তা-ই নয়, একদিন আবিষ্কার করলাম হাইকোর্টে রিট করে তিন মাসের একটি স্থগিতাদেশ পর্যন্ত বের করে ফেলল! পুরো ঘটনার ফলাফল হলো ভয়ানক, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র জানতে পারল কিছু মানুষের চরিত্র হনন করার জন্যে সে ইচ্ছা করলেই একটা পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদ ছাপাতে পারে এবং সেই পত্রিকা তাকে রক্ষা করবে। আমাদের দেশের একটা পত্রিকা অনেক সময় রাজনৈতিক দল, পুলিশ-র‍্যাব এমন কী সরকার থেকেও বেশি ক্ষমতাশালী। এই ঘটনাটি আমার চোখ খুলে দিয়েছে, দেশের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় (আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরও) যদি এ রকম একটা ঘটনা ঘটাতে পারে তা হলে নিশ্চয়ই অন্যান্য পত্রিকায় অসংখ্যবার এই ঘটনা ঘটেছে। আমার একটা বড় ক্ষতি হয়েছে, খবরের কাগজে কিছু লেখা হলে আমি আজকাল ভুরু কুঁচকে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেকে জিজ্ঞেস করি, আসলেই কি এটা ঘটেছে? পত্রিকাটি কি সত্যি কথা বলছে?

যুদ্ধপরাধীদের বিচারের রায় নিয়ে কিছু ব্লগার তরুণ শাহবাগে একত্র হয়ে এই দেশে একটা অভাবিত আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল। সেই তরুণদেরকে হেয় করার জন্যে ঢালাওভাবে তাদের সবাইকে নাস্তিক ঘোষণা করে একটা প্রচারণা শুরু করা হলো। সেই প্রচারণাটি শুরু করল "আমার দেশ" নামের পত্রিকা। আমি লিখে দিতে পারি তারা নিজেরাও বিশ্বাস করে না যারাই ব্লগার কিংবা যারাই যুদ্ধাপরাধীর শাস্তি চেয়ে শাহবাগে গিয়েছে তারা সবাই নাস্তিক। কিন্তু বিষয়টা সেভাবেই উপস্থাপন করা হলো। ব্লগার মানেই নাস্তিক, শাহবাগে যুদ্ধাপরাধের বিচার চাওয়া তরুণ মানেই নাস্তিক। "আমার দেশ" পত্রিকায় ব্লগারদের সাথে আমার ছবি ছাপা হলো যেভাবে সেই ছবিটি উপস্থাপন করা হলো তাতে কী আমার নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকেরা মে মাসের পাঁচ তারিখ ভোরে আমার কাছে লেখা একটা এসএমএস থেকে পেয়ে যাবেন :

> "এই নাস্তিক জাফর ইকবাল, তোদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে। হতে পারে আজ রাতই তোদের শেষ রাত। কাল হয়তো তোরা আর পৃথিবীতে থাকতে পারবি না কারণ এই জমানার শ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদিস আল্লামা আহমদ শফির ডাকে সারা বাংলাদেশের তৌহিদি জনতা মাঠে নেমে এসেছে। সেই সব তৌহিদি জনতা প্রধানমন্ত্রীসহ তোদের সব ধরে ধরে জবাই করে ছাড়বে। আমার আল্লাহকে

নিয়ে, বিশ্বনবীকে নিয়ে কটূক্তি করার ভয়ংকর পরিণাম কী তা আগামীকালকেই হাড়ে হাড়ে টের পাবি তোরা।"

"আমার দেশ" স্বাধীন-নিরপেক্ষ মত প্রকাশের একটা পত্রিকা নয়, এটা স্বাধীনতাবিরোধীদের একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাসকে প্ররোচিত করার একটি পত্রিকা। তাদের প্ররোচণার কারণে এই দেশে অনেক মানুষের জীবন বিপন্ন হয়েছে। কাজেই এই পত্রিকাটির সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে তার দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। তাকে যদি ভয়ংকর মিথ্যা প্ররোচণার জন্যে আইনের আওতায় আনা হয় আমাদের মতো মানুষেরা তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি যখন দেখেছি এই দেশের পনেরটি পত্রিকার সম্পাদক তাকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে গিয়েছেন। এর অর্থটা কী দাঁড়াল? এই পত্রিকাটি যা খুশি লিখতে পারবে, দেশের মানুষের প্রাণ বিপন্ন করে এ রকম মিথ্যা প্ররোচণা করতে পারবে, কিন্তু কেউ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

আমার মনে আছে সামরিক আর বেসামরিক মিলিয়ে ২০০৬ সালের হাইব্রিড তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল। আমার, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তখন অস্থির হয়ে নানাভাবে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করার চেষ্টা করেছিলাম, কোনো পত্রপত্রিকা তখন সেই লেখালেখি ছাপানোর সাহস করেনি। রিমান্ডে নেওয়া সেই শিক্ষকেরা কোনো দিন জানতেও পারেননি এই দেশের কত মানুষ তাদের জন্যে আকুল হয়ে ছিলেন। অনেক কষ্টে আমার দুই-একটি লেখা শুধু কোনো পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছিল সে জন্যে সেই শিক্ষকদের পরিবারের সদস্যদের আমার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। দুঃসময়ে টিকে থাকাটাই হচ্ছে বিজয়, টিকে থাকতে হলে মনের বল থাকতে হয় আর সেই মনের বলটি আসে যখন সবাই জানতে পারে তারা একা নয়, তাদের পাশে অনেকে আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, সামরিক-বেসামরিক হাইব্রিড সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই দেশের অনেক পত্রপত্রিকা সেই সাহসটুকু দেখাতে পারেনি। তাই যখন দেখি সেই পত্রিকার সম্পাদকদের অনেকেই এখন আমার দেশ নামক একটি ধর্মান্ধতা প্রচারযন্ত্রের সম্পাদকের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন তখন আমি মনে কষ্ট পাই, শুভবুদ্ধির ওপর বিশ্বাস হারানোর আশঙ্কা হয়। সত্য এবং মিথ্যার মাঝখানে নিরপেক্ষ থাকা যায় না এই অত্যন্ত সহজ কথাটি কি বোঝার জন্যে খুব কঠিন?

বিগত বিএনপি-জামায়াত আমলে যখন সারা দেশে একটা রুদ্ধশ্বাস অবস্থা তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর। দলীয় শিক্ষকরা নানা ধরনের তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছেন, প্রায় ডিএনএ টেস্ট করে দেখা হচ্ছে রক্তের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রয়েছে কি না, যদি বিন্দুমাত্র চেতনা খুঁজে পাওয়া যায় তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সুতা পর্যন্ত নাড়াতে পারি

না, কিছু করতে দেওয়া হয় না, কোথাও যেতে দেওয়া হয় না। পাঁচ মহাদেশ থেকে পাঁচ শিক্ষাবিদকে জার্মানির একটা অনুষ্ঠানে ডাকা হয়েছে, আমি তাদের একজন, আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো না। আমি আবিষ্কার করলাম শিক্ষকরা যখনই একত্র হচ্ছে তখনই তাদের কথাবার্তা, আলোচনায় ক্ষোভ আর হতাশা, ক্রোধ আর যন্ত্রণা। একাত্তরে আমি একটা জিনিস শিখেছিলাম, সেটা হচ্ছে যুদ্ধের আসল অস্ত্র রাইফেল নয়, যুদ্ধের আসল অস্ত্র হচ্ছে মনোবল; তাই কখনো মনোবল হারাতে হয় না। সহকর্মীদের মনোবল ধরে রাখার জন্যে আমরা তখন অনেক কিছু করেছি। তার মাঝে সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল আমাদের সান্ধ্যকালীন আড্ডা। বেশ কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে আমরা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান প্রযুক্তি দর্শন এ রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। শ্বাসরুদ্ধকর একটা পরিস্থিতিতে যখন স্বাধীনতাবিরোধীদের এ রকম রমরমা অবস্থা তখন আমাদের এই পুরোপুরি বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনাগুলো ছিল খুব আনন্দের। মনোবল ধরে রাখার জন্যে অসাধারণ।

সন্ধ্যেবেলা বসে তরুণ শিক্ষকদের সাথে বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনার বিষয়টি আমি পরেও চালু রেখেছি। তাই নিয়মিতভাবে আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষকদের সাথে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাইরে যে বিশাল একটা জগৎ আছে, তারা আমাকে অনেক সময়েই তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। কোনো একটা ছুটির পর শিক্ষকদের সাথে কথা বলছি তখন হঠাৎ করে তাদের কাছ থেকে একটা বিচিত্র বিষয় জানতে পারলাম, তারা সবাই তাদের নিজেদের এলাকা থেকে ঘুরে এসেছে এবং সবাই বলেছে যে তাদের এলাকার সাধারণ মানুষেরা জানে এবং বিশ্বাস করে মে মাসের পাঁচ তারিখে মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। একটা অনেক বড় মিথ্যা কথাকে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি এমনি এমনি ঘটেনি। এর জন্যে কাজ করতে হয়েছে, পরিশ্রম করতে হয়েছে, অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে—সেই তথ্য প্রচার করা হলেও সেদিন যে অসংখ্য কোরান শরিফ পোড়ানো হয়েছিল সেই তথ্যটি কিন্তু প্রচার করা হয়নি। রাতের আকাশে ইউ.এফ.ও. দেখা গেছে কিংবা একটা ছাগল মানুষের গলায় কথা বলে—এ রকম মিথ্যা প্রচারিত হলে ক্ষতি হয় না কিন্তু রাতের অন্ধকারে গোপনে কয়েক হাজার মুসল্লিকে হত্যা করা হয়েছে—এ রকম একটি ভয়ংকর মিথ্যা প্রচার করা হলে সব দিক দিয়ে ক্ষতি হয়।

কয়েক হাজার মুসল্লিকে হত্যা করা হয়েছে সেটি প্রচারিত হয়েছে গোপনে। প্রকাশ্যে সর্বশেষ যে প্রচারণাটি ছিল সেটি হচ্ছে ৬১ জনের, "অধিকার" নামে একটি সংগঠন সেটি দেশে-বিদেশে প্রচার করেছে। কয়েক হাজার থেকে সংখ্যাটি ৬১-তে নেমে এসেছে তাই সরকারের খুশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সরকার খুশি হয়নি, তারা ৬১ জনের নাম জানতে চেয়েছে, আমিও জানতে চাইতাম। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় অভিযোগ করলে তার প্রমাণ থাকতে হয়। অধিকার নামক সংগঠনটি নাম

প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, কারণটি আমরা বুঝতে পারি, কারণ পুরো ঘটনাটি টেলিভিশনে দেখিয়েছে, সাংবাদিকরা রিপোর্ট করেছে এবং কোথাও এত বড় একটি সংখ্যা কেউ দেখেনি। সরকার তখন মিথ্যা একটি তথ্য প্রচারের জন্যে অধিকার নামক সংগঠনের সম্পাদক আদিলুর রহমান খানকে গ্রেপ্তার করেছে।

"আমার দেশ"-এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের পক্ষে যে রকম পনেরোজন সম্পাদক দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, আদিলুর রহমান খানের পক্ষে এখন আরো বেশি মানুষ দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। শুধু পত্রপত্রিকা নয়, বড় বড় মানবাধিকার সংগঠন, রাজনৈতিক দল, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান এমন কী আমাদের দেশের বড় বড় জ্ঞানী-গুণী মানুষ। অধিকার সংগঠনটি যদি বলত অনেক মানুষ মারা গেছে এবং তখন তাকে যদি গ্রেপ্তার করা হতো সেটা বাক-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলা যেত। কিন্তু যখন সংখ্যাটি অত্যন্ত নিখুঁত ৬১ তখন তাদেরকে এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া হবে সেটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য কিছু নয়, ২১ আগস্ট ঘটনার পর বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের কথা কেউ কি ভুলে গেছে?

এই দেশের যে সকল সুধীজন মে মাসের ৫ তারিখে মতিঝিলের "গণহত্যার" একজন প্রবক্তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের কাছে আমার শুধু ছোট একটি প্রশ্ন, তথ্যটি যদি মিথ্যা হয় তাহলেও কি আপনি তার পাশে এসে দাঁড়াবেন? বাক-স্বাধীনতা চমৎকার বিষয়, আমি কয়েকজন সম্পাদকের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, তারপরেও যদি এই লেখাটি সেই পত্রিকায় ছাপা হয় সেটি বাক-স্বাধীনতা। কিন্তু একটা মিথ্যা তথ্য যদি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয় তখন সেই তথ্য প্রচার করার অধিকার বাক-স্বাধীনতা নয়, তখন সেই অধিকার হচ্ছে মিথ্যা কথা বলার অধিকার।

এই দেশে এমনিতেই অনেক মিথ্যা কথা বলা হয়েছে, এখন কি আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে সেটাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হবে?

[আগস্ট ১৬, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

এই লজ্জা কোথায় রাখি

১.

কাক কাকের গোশত খায় না—কিন্তু এবারে মনে হয় একটু খেতেই হবে। আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে আমি সাধারণত অন্য বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে মন্তব্য করি না। কিন্তু এবারে মনে হয় করতেই হবে। আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি, আমার মতো শিক্ষকরা সেই ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরকে তার অফিসে আটকে রেখেছেন। খবরে জেনেছি, এই মুহূর্তে দয়া করে পনেরো দিনের জন্য দম নেওয়া হচ্ছে, তারপর সম্ভবত আবার নব উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে।

আগেই বলে রাখি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং তার শিক্ষকদের ভেতর কী সমস্যা সেটা আমি অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারছি না। শিক্ষকরা বলছেন তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ, ভাইস চ্যান্সেলর বলছেন, তদন্ত কমিটি করে সেই অভিযোগ যাচাই করা হোক। তার পরেও সেখানে শিক্ষকরা কেন তাদের ভাইস চ্যান্সেলরকে আটকে রেখেছেন সেটা আমার মোটা বুদ্ধিতে ধরতে পারছি না। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি থেকে বোঝার চেষ্টা করছি কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হচ্ছে না। আমাদের দেশে লেখালেখির একটা নূতন স্টাইল শুরু হয়েছে, সবারই একটা নিরপেক্ষতার ভান করতে হয়। তাই কেউ যদি গুরুতর অন্যায়ও করে সোজাসুজি স্পষ্ট করে কেউ লিখে না; ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে গা বাঁচিয়ে লিখে, যেন কেউ কিছু না বলতে পারে। আজকাল পত্রপত্রিকার ইলেকট্রনিক ভার্সান রয়েছে, সেখানে কোনো লেখা ছাপা হলে তার লেজে পাঠকেরা আবার ভুল বানান এবং অমার্জিত ভাষায় যা কিছু লিখতে পারে! তাই সবাই ভয়ে ভয়ে লেখে, কার আর সত্যি কথা বলে গালমন্দ খেতে ভালো লাগে? আমি অবশ্য ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে দুর্বোধ্যভাবে কিছু বলার চেষ্টা করছি না—একেবারে সোজাসুজি বলছি, একজন ভাইস চ্যান্সেলরকে তার

অফিসে দিনের পর দিন আটকে রাখা খুব বড় একটা অন্যায় কাজ। কথাটা আর একটু পরিষ্কারভাবে বলা যায়, মানুষটি একজন ভাইস চ্যান্সেলর না হয়ে যদি একজন জুনিয়র লেকচারার কিংবা একজন অপরিচিত ছাত্রও হতো তাকেও একটা ঘরের মাঝে আটকে রাখা গুরুতর একটি অন্যায়। স্বাধীন একটা দেশে কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা ঘরে জোর করে আটকে রাখা যায় না, আমি আইনের মানুষ নই কিন্তু আমার ধারণা দেশের আইনে এটা নিশ্চয়ই একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষকরা এই কাজটি করছেন আমার এই লেখাটি তাদের চোখে পড়বে কি না আমি জানি না। যদি পড়ে তাহলে তাদের প্রতি আমার একটা ছোট অনুরোধ। ঘরে তাদের অনেকেরই নিশ্চয়ই কম বয়সী ছেলেমেয়ে আছে। পনেরো দিন পর তারা আবার যখন তাদের ভাইস চ্যান্সেলরকে তার অফিসে অবরুদ্ধ করে ফেলবেন তখন তারা রাতে বাসায় ফিরে গিয়ে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে নিচের এই বাক্যালাপগুলো করবেন। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বলবেন, "বাবা, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একটা বিশাল কাজ করে এসেছি!" ছেলেমেয়েরা তখন বলবে, "কী কাজ বাবা (কিংবা কী কাজ মা?)" তখন তারা বলবেন, "আমাদের একজন ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, তাকে আমরা দুই চোখে দেখতে পারি না। তাই তাকে 'আমরা তার অফিসে আটকে রেখেছি। সেখান থেকে তাকে আমরা বের হতে দিই না।''

আমি ছোট বাচ্চাদের যেটুকু জানি তাতে আমার ধারণা তখন তারা চোখ বড় বড় করে বলবে, "বের হতে দাও না?"

"হ্যাঁ, জেলখানায় যে রকম কেউ বের হতে পারে না, সে রকম। তাকে আমরা অফিস থেকে বের হতে দিই না। জেলখানার মতো আটকে রেখেছি।"

বাক্যালাপের এ রকম পর্যায়ে শিক্ষকদের ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করতে পারে, "তোমাদের ভাইস চ্যান্সেলরের ছেলেমেয়ে নেই? তারা কী বলে?"

"তাদের আবার বলার কী আছে? একটা মেয়ে শুনেছি লেখাপড়া করতে বিদেশে গিয়েছে। তাকেও বিদায় জানাতে আমরা ভাইস চ্যান্সেলরকে এয়ারপোর্ট যেতে দেই নাই।" বাচ্চাগুলো তখন নিশ্চয়ই শুকনো মুখে তাদের বাবা কিংবা মায়ের মুখের দিকে তাকাবে, চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করবে, "সত্যি?"

শিক্ষকরা তখন বলবেন, "হ্যাঁ। উচিত শিক্ষা হচ্ছে। তোমরা যখন বড় হবে তখন তোমাদের যদি মানুষকে অপছন্দ হয় তাহলে তোমরাও তাকে এইভাবে একটা ঘরে আটকে ফেলবে। বের হতে দিবে না!"

আমার ধারণা শিক্ষকদের ছেলেমেয়েরা আলোচনার এই পর্যায়ে একধরনের আহত এবং আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাদের বাবা (কিংবা মা)-এর দিকে তাকিয়ে থাকবে। আমার খুব জানার ইচ্ছে এবং আমি খুবই কৃতজ্ঞ হতাম যদি এই শিক্ষকদের কেউ আমাকে জানাতেন এই ধরনের একটা কথোপকথনের পর তাদের ছেলেমেয়েরা কী বলেছে।

২.

পৃথিবীর যেকোনো দেশে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্ভবত সেই দেশের সবচেয়ে জ্ঞানী এবং গুণী মানুষ। সবচেয়ে বড় বুদ্ধিজীবী, সবচেয়ে বড় মুক্তবুদ্ধিতে বিশ্বাসী মানুষ এবং সম্ভবত জাতির সবচেয়ে বড় বিবেক। তাই সাধারণ মানুষ যখন দেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্বাধীন দেশের একজন নাগরিককে জেলখানার মতো একটা ঘরে আটকে রাখছে তখন তারা নিশ্চয়ই হতবাক হয়ে যায়। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই পুরো প্রক্রিয়াটার নাম দেওয়া হচ্ছে "আন্দোলন"। মনে হয় আন্দোলন বলা হলেই পুরো বিষয়টাকে ন্যায়সংগত, প্রগতিশীল, সত্যের জন্যে সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই দেখা গেল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সংগ্রামী নেতৃবৃন্দকে আলোচনার জন্যে তার বাসায় ডেকে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ কোনো একজন মানুষকে জোর করে একটা ঘরে আটকে রাখা হলে কাউকেই কোনো ধরনের আইনি ঝামেলায় পড়তে হয় না, বরং দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তাদের নিজের বাসায় ডেকে নিয়ে যান। সোজা কথায়, এত বড় একটা অনৈতিক এবং বেআইনি বিষয়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে নৈতিক সমর্থন দেওয়া হয়।

এই দেশে বিষয়টা অবশ্যি নূতন নয়। কাউকে জিম্মি করে কোনো একটা দাবি আদায় করে নেওয়া এই দেশের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। যারা ভদ্রতা করে এটা করে না তাদেরকে মেরুদণ্ডহীন অপদার্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমি নিজের কানে এই দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষককে বলতে শুনেছি, "এমনিতে কাজ হবে না, গিয়ে ঘেরাও করো, রাস্তাঘাটে কিছু ভাঙচুর করো তখন কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে।" তাই দাবি আদায়ের জন্যে কাউকে জিম্মি করে ফেলা যে একটি বেআইনি কিংবা অত্যন্ত অমানবিক কাজ হতে পারে সেটা কেউ মনে পর্যন্ত করে না।

শুধু যে দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী মহোদয় এই ধরনের বেআইনি কাজকে নিজের অজান্তেই গ্রহণযোগ্যতার সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন তা নয়, আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাও তাদের কাজকে সম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তারা দুই পক্ষকেই সমানভাবে নিজেদের বক্তব্য রাখতে দিচ্ছেন, পত্রিকার পাশাপাশি পৃষ্ঠায় তাদের বক্তব্য ছাপা হচ্ছে। আমি সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। সব কিছু যে বুঝতে পেরেছি সেটা দাবি করব না। আমি বহুকাল থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি তাই একটা জিনিস জেনেছি, প্রকাশ্যে যে কথাগুলো বলা হয় সেগুলো সব সময় পুরো কথা নয়, আসল কথা নয়। প্রকাশ্য কথার পেছনে অপ্রকাশ্য কথা থাকে, গোপন এজেন্ডা থাকে, অনেক সময় দেখা গেছে সেগুলোই মূল ব্যাপার। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবরোধের ব্যাপারে কোনটা সত্যিকার কথা সেটা জানি না তবে অভিযোগ থাকলে তদন্ত হবে, শাস্তি হবে কিন্তু আগেই নিজেরা শাস্তি দিয়ে একজনকে তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হবে সেটি কোন দেশের বিচার?

পনের দিন পরে কী হবে আমরা জানি না। তবে একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলা যায়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা খুব ভয়ংকর উদাহরণ তৈরি হলো। কোনো একজন মানুষকে পছন্দ না হলে তাকে সরানোর জন্যে কয়েকজন (কিংবা অনেকজন)

মানুষ একত্র হয়ে তাকে একটা ঘরে আটকে ফেলতে পারবেন—এর জন্যে কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না, দেশের আইন তাদের স্পর্শ করবে না। যেসব শিক্ষক অপছন্দের মানুষকে ঘরের ভেতর আটকে ফেলার কালচার চালু করলেন, তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে ভাইস চ্যান্সেলর হবেন। ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব খুব কঠিন দায়িত্ব, নিশ্চিতভাবেই তখন তারা সবাইকে সমানভাবে খুশি করতে পারবেন না। তখন তাদেরকে যখন অন্য শিক্ষকরা ঘরের মাঝে বন্দি করে ফেলবেন তখন তারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন কি না জানার ইচ্ছে করে।

৩.

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৈরি হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করানোর জন্যে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এখন মনে হয় সেটা কারো মনে নেই। অনেকেরই ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকরিটি বুঝি তার নিজের "সুখ-সুবিধার জন্যে"। নিজেদের "অধিকার" আদায় করার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার বিষয়টি যদি পুরোপুরি চাপা পড়ে যায় তাতেও কেউ কিছু মনে করে না। ছাত্রছাত্রীদের কারণে, ধর্মঘট, মারামারি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে—এ রকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকরা তাদের নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ করে রেখেছেন সে রকম উদাহরণ খুব বেশি নেই। উদাহরণটি খুব ভালো নয়, সারা দেশে আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর খুব বড় একটা গ্লানি নেমে এসেছে। এই গ্লানি থেকে আমরা খুব সহজে বের হয়ে আসতে পারব বলে মনে হয় না।

৪.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আনোয়ার হোসেনকে আজ থেকে ছয় বছর আগে ঠিক এই রকম সময়ে মিলিটারি সরকার গ্রেফতার করে নিয়েছিল। তার লেখা বইয়ে আমি পড়েছি, চোখ বেঁধে তাকে নিয়মিতভাবে রিমান্ডে নেওয়া হতো। তাই আমরা জানি তার জেল খাটার অভিজ্ঞতা এবং মিলিটারি অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা বেশ ভালো রকমেই আছে। আপাতত শিক্ষকদের চার দিনের রিমান্ড থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পনের দিন পর যখন আবার শিক্ষকরা তাকে তাদের জেলখানা রিমান্ডে নিয়ে যাবেন, আমি আশা করছি, তিনি যেন ধৈর্য ধরে সেটা সহ্য করতে পারেন।

ছয় বছর আগে তাকে যখন মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তখন আমি আর আমার স্ত্রী, তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যাকে সাহস দিতে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। পনের দিন পর যখন শিক্ষকরা আবার তাকে ঘরে আটকে ফেলবেন তখন হয়তো আমাদের আবার তার বাসায় গিয়ে স্ত্রী, পুত্র-কন্যাকে সাহস দেওয়ার কথা—কিন্তু আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি তাদেরকে এবার লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

[আগস্ট ৩০, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

আমার লেখার শিরোনাম দেখে কেউ যেন মনে না করেন আমি সাহিত্যের প্রকৃতি আর সাহিত্যিকদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী কিছু লিখতে বসেছি—এটি মোটেও সে রকম কিছু নয়। এই লেখাটি পুরোপুরি ব্যক্তিগত কিছু বিষয়ের ওপর লেখা।

বলা যেতে পারে আমি সাহিত্যিক পরিবারের একজন মানুষ। আমার বাবা লেখালেখি করতেন, তার একটি প্রকাশিত বই আছে, একাত্তর সালে যখন পাকিস্তানি মিলিটারির হাতে মারা গিয়েছিলেন তখন আমাদের বাসা লুট করে নেওয়ার সময় অনেকগুলো পাণ্ডুলিপি চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে। আমার মায়েরও স্মৃতিচারণামূলক একটা প্রকাশিত বই আছে। বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ সম্ভবত বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। ছোট ভাই আহসান হাবীব কার্টুনিস্ট হিসেবে পরিচিত—ইদানীং অনেক লিখছে। বোনেরাও চমৎকার লিখতে পারে, তাদের ছেলেমেয়েরাও লিখছে। তিন প্রজন্ম লেখক, কাজেই আমি নিজেও একটু লেখালেখি করি। মহৎ সাহিত্য রচনার চেষ্টা করিনি। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে লিখি, সায়েন্স ফিকশান লিখি—জীবনের অভিজ্ঞতা সীমিত, তাই মহাকাশ বা ভিন গ্রহের আগন্তুকদের কর্মকাণ্ড লিখে সময় কাটাই—বাস্তবধর্মী হয়নি বলে কেউ অভিযোগ করতে পারে না।

মহৎ সাহিত্য না হলেও যেহেতু সাহিত্যের একটা আবহের মাঝে বড় হয়েছি তাই মোটামুটিভাবে বিষয়টা বুঝি—যেটুকু বুঝি তার চেয়ে বেশি উপভোগ করি। তাই সাহিত্যের মাঝে পাঠকরা কী আশা করে সে সম্পর্কে একটা ধারণা আছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার নিজের একধরনের হিসেব ছিল, আমি জানতাম পাঠকরা সাহিত্য উপভোগ করে। পেছনের মানুষটি নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা থাকে না, সোজা কথায় পাঠকদের আগ্রহ সাহিত্যে, সাহিত্যিকে নয়। একসময় আমি অবাক হয়ে

দেখলাম অন্তত আমাদের বাংলাদেশে পাঠকরা শুধু সাহিত্যে নয়, সাহিত্যিকের জন্যেও খুব ব্যস্ত।

ব্যাপারটি আবিষ্কার করলাম হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে। তখন মাত্র দেশে ফিরে এসেছি, একদিন হুমায়ূন আহমেদ আমাকে নিয়ে বইমেলায় যাচ্ছে। বইমেলায় যে রকম মজা, বইমেলা যাওয়ার রাস্তাটা প্রায় সমান সমান মজা—সেখানে এমন কোনো জিনিস নেই যেটা হৈচৈ করে বিক্রি হয় না। আমি হুমায়ূন আহমেদের সাথে সেই রাস্তায় রওনা হয়েছি, সে আমাকে থামাল, বলল, "ওদিক দিয়ে যাবি না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে কোন দিক দিয়ে যাব?"

"রেসকোর্সের ভেতর দিয়ে। এই রাস্তায় গেলে উপায় আছে?"

কীসের উপায় নেই আমি তখনো পরিষ্কার বুঝতে পারিনি—তবুও তার পেছন পেছন রেসকোর্সের ভেতর দিয়ে গিয়ে বাংলা একাডেমীর কাছাকাছি এসে বইমেলায় ঢুকে গেলাম। মানুষজনের দৃষ্টি এড়িয়ে কোনোমতে একটি বইয়ের স্টলে ঢুকে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার পর হুমায়ূন আহমেদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আমি দেখলাম কিছুক্ষণের ভেতরে সেই বইয়ের স্টলে হাজার হাজার মানুষ, আরো কিছুক্ষণ পর দেখলাম, স্টলটি ভেঙে যাওয়ার অবস্থা, আরো কিছুক্ষণ পর দেখলাম, পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করছে!

ক্রিকেট প্লেয়ার নয়, টিভি স্টার নয়, সিনেমার নায়ক নয়—একজন লেখকের জন্যে মানুষের এ রকম পাগলামি হতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

হুমায়ূন আহমেদ যেসব লেখালেখি করেছে পাঠকেরা সেটা আগ্রহে গ্রহণ করেছে। মহৎ সাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে কী থাকবে না সেটি পরের ব্যাপার কিন্তু বাংলাদেশের কয়েক প্রজন্মকে সে বই পড়তে শিখিয়েছে, জোছনা আর বৃষ্টিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে, রাজাকারদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছে, প্রেমে পড়তে এবং প্রেম করতে শিখিয়েছে—একজন লেখক তার জীবনে এর থেকে বেশি কী চাইতে পারে?

আমি জানতাম হুমায়ূন আহমেদ খুব জনপ্রিয় কিন্তু সেটি কোন পর্যায়ের সেটি বুঝতে পেরেছিলাম তার মৃত্যুর পর। নানা কারণে আমি তখন ছোটাছুটি করছি, টেলিভিশন দেখার সময় নেই, কিন্তু তাকে কবর দিয়ে ফিরে এসে জানতে পারলাম তার দেহটি নিউ ইয়র্ক থেকে দেশে আনার পর থেকে তাকে সমাহিত করা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেল লাইভ প্রচার করে গেছে। পৃথিবীর আর কোনো লেখক কী এত বড় সম্মান পেয়েছে?

ছোট একটা গল্প বলে শেষ করি। আমি তখন সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, দীর্ঘদিন আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের ডিপার্টমেন্টটি গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। একটু-আধটু লেখালেখি করি। লেখক

হিসেবে একটু পরিচিতিও হয়েছে। একদিন ক্যাম্পাসের রাস্তা ধরে হাঁটছি, তখন একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ এগিয়ে এলো, আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি অনেক দূর থেকে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি।"

কারো সাথে অনেক দূর থেকে কেউ দেখা করতে এলে যে রকম মুখভঙ্গি করা উচিত আমি সে রকম বিনয়ের মুখভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভদ্রলোক বললেন, "আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমি বের করেছি।"

আমি হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভদ্রলোক বললেন, "আমি কী আপনার হাতটা একটু ছুঁতে পারি?"

আমি একটু বিব্রতভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। ভদ্রলোক হাতটা ধরে নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরলেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আমি হুমায়ূন আহমেদের আপন ভাইয়ের হাতটা ছুঁয়ে দেখতে পারছি।"

এই হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদ!

[অস্ট্রেলিয়াস্থ বাংলা সাহিত্য সংসদের স্মরণিকা ২০১৩-এ প্রকাশিত]

আমেরিকা নিয়ে এক ডজন

আমার ছয়জন ছাত্রছাত্রী একসাথে আমেরিকা চলে যাচ্ছে, একজন চাকরি করতে অন্যেরা পিএইচডি করতে। এরা সবাই এখন আমার সহকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতাকে জীবন হিসেবে বেছে নিলে পিএইচডি করতে হয়। যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো। আমি নিজেও আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বছরের ঠিক এই সময়টাতে পিএইচডি করতে আমেরিকা গিয়েছিলাম। আমার এই ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেছে নেওয়ার আগে কোথায় কী ধরনের প্রোগ্রাম, কোন প্রফেসর কী গবেষণা করেন, তাদের র‍্যাংকিং কী রকম এসব নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছে। আমার মনে আছে, আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়টি ঠিক করেছিলাম তার প্যাডের কাগজটি দেখে (না, আমি মোটেও বানিয়ে বলছি না।)

যাওয়ার আগে আমার ছাত্রছাত্রীরা সবাইকে নিয়ে বিশাল একটা পার্টি দিয়েছে। আমি আমেরিকাতে আঠারো বছর ছিলাম, এর পরেও অনেকবার যেতে হয়েছে, তাই পার্টি শেষে সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি যাওয়ার আগে সেই দেশটি নিয়ে কোনো বাস্তব উপদেশ শুনতে চাও? যে উপদেশ বইপত্র, ইন্টারনেট কোথাও পাবে না? তারা সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনতে রাজি হলো। আমি তাদেরকে তখন এক ডজন তথ্য এবং উপদেশ দিয়েছিলাম, সেগুলো ছিল এ রকম :

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (বা সহজ কথায় আমেরিকা) পুরো পৃথিবীকে দেখে স্বার্থপরের মতো কিন্তু তারা নিজের দেশের জন্যে সাংঘাতিকভাবে নিঃস্বার্থ। (একাত্তরে দেশটি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু তাদের দেশের মানুষ ছিল আমাদের পক্ষে।) এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে যেসব দেশে হানাহানি, খুনোখুনি, যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে খোঁজ নিলে দেখা যাবে সব জায়গায় সূক্ষ্মভাবে হলেও আমেরিকার একটা যোগাযোগ আছে। তবে দেশটি যেহেতু নিজের দেশের মানুষকে ভালোভাবে দেখেশুনে রাখে তাই থাকার জন্যে সেটি চমৎকার একটা জায়গা। সারা পৃথিবী থেকে সব দেশের

মানুষ সেখানে গিয়ে ওটাকে একটা মিনি পৃথিবী বানিয়ে ফেলেছে। এই দেশে কেউই বিদেশি নয়, তাই থাকার জন্যে, লেখাপড়া বা গবেষণা করার জন্যে আমেরিকার কোনো তুলনা নেই।

(২) আমেরিকার সাধারণ মানুষেরা গোমড়ামুখী নয়, তারা খুব হাসি-খুশি। পথেঘাটে সুন্দরী মেয়েরা খামাখা মিষ্টি হাসি দিলেই তারা প্রেমে পড়ে গেছে ভাবার কোনো কারণ নেই।

(৩) পশ্চিমা দেশের মানুষরা নাম নিয়ে মোটেও সৃজনশীল নয়। তারা ধরেই নেয় সবার নামের দুটো অংশ থাকবে, প্রথম অংশটা হচ্ছে ঘনিষ্ঠদের ডাকার জন্যে এবং শেষ অংশটা আনুষ্ঠানিক পারিবারিক নাম। পারিবারিক নাম যে নামের প্রথমে থাকতে পারে (শেখ মুজিবুর রহমান) সেটা তারা জানে না। খেয়ালি বাবা হলে যে পারিবারিক নাম নাও থাকতে পারে (বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদ, মেজ ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল ছোট ভাই আহসান হাবীব) সেটাও তারা জানে না। একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই নামের প্রথম অংশ দিয়ে ডাকা শুরু করে বলে এই আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষেরা আমেরিকা পৌঁছানোর কিছুদিনের ভেতরে আবিষ্কার করে সবাই তাদেরকে মোহাম্মদ বলে ডাকছে! তাই ঘনিষ্ঠদের কাছে কে কী নামে পরিচিত হতে চায় সেটা একেবারে প্রথম দিনে পরিষ্কার করে খোলাখুলি বলে দেওয়া ভালো। আমেরিকায় নামের আগে মোহাম্মদের সংক্ষিপ্ত রূপ MD লেখা খুবই বিপজ্জনক, তারা সেটাকে ডাক্তারি ডিগ্রি মনে করে সব সময়েই নামের পিছনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে!

(৪) যখন প্রথম প্রথম কেউ আমেরিকা যায় তখন তাদের স্কলারশিপ বা বেতনের চেক পায় ডলারে কিন্তু তারা যখন খরচ করতে যায় তারা সেটা ডলারে খরচ করতে পারে না, তারা খরচ করে টাকায়। নিজের অজান্তেই কোনো কিছুর দাম দেখা মাত্র মনে মনে ৮০ দিয়ে গুণ করে ভিরমি খেতে শুরু করে। এক কাপ কফির দাম একশ থেকে তিনশ টাকা, সিনেমার টিকেট আটশ থেকে হাজার টাকা, আইসক্রিমের কোন দুইশ থেকে পাঁচশ টাকা, গানের সিডি প্রায় হাজার টাকা, একটা বই দুই থেকে তিন হাজার টাকা। মধ্যবিত্ত সন্তানের পরিবারের জন্যে সেখানে কেনাকাটা করা রীতিমতো কঠিন একটা ব্যাপার। (তবে বড়লোকের ছানাপোনারা যারা এই দেশে বনানী-গুলশানের হাইফাই দোকানপাট রেস্টুরেন্টে ঘোরাফেরা কিংবা খানাপিনা করে অভ্যস্ত তাদের জন্যে ব্যাপারটা সহজ, এই দেশে তারা মোটামুটি আমেরিকান দামেই কেনাকাটা বা খানাপিনা করে।) কাজেই, অন্য সবার প্রথম কাজ হচ্ছে কোনো কিছু কেনার আগে মনে মনে আশি দিয়ে গুণ করে ফেলার অভ্যাসটুকু ঝেড়ে ফেলা।

আমেরিকায় কেনাকাটার আরেকটা বিষয় হচ্ছে "টিপস", এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে বখশিশ কিন্তু বখশিশ শব্দটার মাঝে তাচ্ছিল্য এবং অবমাননার ছাপ রয়েছে। টিপস শব্দটিতে তাচ্ছিল্য কিংবা অবমাননা নেই। আমেরিকার মূলধারায় প্রায় সব তরুণ-তরুণী জীবনের কোনো না কোনো সময়ে রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করে বড় হয়েছে। তখন তাদের বেতন বলতে গেলে ছিলই না এবং খদ্দেরদের টিপসটাই ছিল

তাদের বেতন। সে দেশের রেস্টুরেন্টের ওয়েটার, নাপিত বা ক্যাব ড্রাইভারকে টিপস দিতে হয়। হতচ্ছাড়া কিপটে মানুষদের হাত গলে ১০% টিপসও বের হতে চায় না, দরাজদিল মানুষেরা দেয় ২০% আর মাঝামাঝি পরিমাণ হচ্ছে ১৫%!

কাজেই বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে কোথাও খেতে গেলে মেন্যুতে খাবারের দামটা দেখে আগেভাগেই তার সাথে ১৫% থেকে ২০% যোগ করে রাখাটা জরুরি।

(৫) আমরা হাত দিয়ে ডালভাত, সবজি, মাছ, মাংস মাখিয়ে মাখিয়ে খাই। আমেরিকা গিয়েও বাসার ভেতরে নিজে রান্না করে সবকিছু হাত দিয়ে খাওয়া যাবে। বাইরে হ্যামবার্গার, স্যান্ডউইচ কিংবা পিৎজা (উচ্চারণটা পিজ্জা নয় পিৎজা) হাত দিয়ে খেতে পারলেও বেশিরভাগ খাবার ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করে খেতে হবে। আমাদের এই অঞ্চলে খাবার জন্যে চামচ দেওয়া হয়, ইউরোপ-আমেরিকায় কিন্তু ডাইনিং টেবিলে চামচ নেই, শুধু ছুরি আর কাঁটা। কোন হাতে ছুরি কোন হাতে কাঁটা ধরতে হয় সে রকম নানা ধরনের নিয়মকানুন রয়েছে, সেই নিয়ম আবার ইউরোপে একরকম আমেরিকায় অন্য রকম, কিন্তু মূল বিষয়টা খুব সহজ। বেশিরভাগ মানুষ ডান হাতে কাজ করে এবং কাটাকাটি করতে একটু জোর লাগে তাই ছুরিটা থাকবে ডান হাতে (এবং খাওয়ার প্রক্রিয়াতে সেটা কখনো মুখে ঢোকানো যাবে না, প্রয়োজনে আমি ডাইনিং টেবিলে একে অন্যের ছুরি ব্যবহার করতে দেখেছি।) এটাই নিয়ম। আমেরিকাতে কাটার জন্যে কোনো নিয়ম নেই। যারা ডান হাতে কাজ করে অভ্যস্ত তারা ছুরি দিয়ে কাটাকাটি শেষ করে প্লেটে ছুরিটা রেখে ডান হাতে কাঁটাটা তুলে নিয়ে খায়। শুনেছি বিশুদ্ধ এরিস্টোক্রেট (বাংলা প্রতিশব্দ সম্ভ্রান্ত শব্দটি এরিস্টোক্রেসি পুরোটা ফুটে উঠে না তাই আসল শব্দটাই ব্যবহার করতে হলো!) মানুষেরা মরে গেলেও ডান হাতে মুখে খাবার তুলে না। এই নিয়মগুলো কে করেছে এবং কেন এই নিয়মেই খেতে হবে, অন্য নিয়মে কেন খাওয়া যাবে না, আমি তার উত্তর জানি না। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, আমেরিকানরা কিন্তু চপ স্টিক (দুই টুকরো কাঠি) দিয়ে খেতে পারে। আমার ধারণা একবার চপ স্টিক দিয়ে খেতে শিখে গেলে খাওয়ার জন্যে এটা খুব চমৎকার একটা পদ্ধতি।

আমার কিছু আমেরিকান বন্ধু আমাদের দেখাদেখি হাতে খেতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা আঙুল দিয়ে খাবার মাখিয়ে মুখ পর্যন্ত নিয়ে গেলেও মুখে সেই খাবার ঢোকাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছে। পাঁচটা আঙুল মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে সেখানে খাবারটা ছেড়ে দিতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে কাজটা মোটামুটি অসম্ভব। যারা আগে কখনো লক্ষ করেনি তাদেরকে বলে দেয়া যায় আমরা কিন্তু মুখের ভেতর আঙুল ঢোকাই না, বুড়া আঙুল দিয়ে ঠেলে খাবারটা মুখে ঢুকিয়ে দিই, অত্যন্ত দক্ষ একটা পদ্ধতি।

খাবারের কথা বলতে হলেই পানীয়ের ব্যাপারটা তার সাথে চলে আসে। আমেরিকায় ট্যাপের পানি বিশুদ্ধ, তাই পানি কিনে খাবার প্রয়োজন নেই। শুনেছি নিউ ইয়র্কের মানুষ মোটা হয়ে যাচ্ছে বলে বিশাল আকারের সফট ড্রিংক বেআইনি করে

দেওয়া হয়েছে! তবে অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় (সোজা বাংলায় মদ) নিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করা যায়, যারা এটা খেতে চায় না, আমেরিকানরা কখনোই তাদেরকে সেটা খেতে জোরাজুরি করবে না। তবে মদ খাওয়া বাঙালিদের কথা আলাদা, তারা নিজেরা সেটা খায় বলে অন্যদের খাওয়ানোর জন্যে বাড়াবাড়ি ব্যস্ত থাকে। বাঙালিদের আসরে তারা অন্য বাঙালিদের জোর করে, তাদের চাপ দেয় এবং না খেলে তাকে নিয়ে টিটকারি, ঠাট্টা-তামাশা করে। এর কারণটা কী আমি এখনো বের করতে পারিনি।

(৭) খাবার এবং পানীয়ের কথা বলা হলেই এর পরবর্তী ধাপ হিসেবে টয়লেটের কথা বলা উচিত। লোকচক্ষুর আড়ালে এর খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে কিন্তু ছাপার অক্ষরে কিছু লিখে ফেলাটা শোভন হবে না। এই ভয়ংকর বিষয়টা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে, আমরা যেভাবে শিখেছি!

(৮) ডাইনিং টেবিল আর টয়লেটের পরে নিশ্চয়ই বাথরুমের ব্যাপারটা আসার কথা। নিজের বাসায় নিরিবিলি বাথরুমের মাঝে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমেরিকার গণবাথরুমের মতো ভয়ংকর আর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই। আমাকে আগে থেকে কেউ সতর্ক করে দেয়নি তাই প্রথমবার যখন আমার ডর্মিটরির গণবাথরুমে একজন আমার সামনে জামা-কাপড় খুলে পুরোপুরি ন্যাংটো হয়ে গিয়েছিল সেই আতঙ্কের কথা আমি কোনো দিন ভুলব না। এরপর অনেক দিন পার হয়েছে আমি অনেক কিছুতে অভ্যস্ত হয়েছি কিন্তু গণবাথরুমে উদাস মুখে শরীরে একটা সুতা ছাড়া সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই দৃশ্যে আমি কোনো দিন অভ্যস্ত হতে পারিনি। এই জন্মে সেটা সম্ভব হবে বলেও মনে হয় না।

ছেলেরা ছেলেদের সামনে আর মেয়েরা মেয়েদের সামনে জামা-কাপড় পুরোপুরি খুলে ফেলতে কোনো লজ্জা অনুভব করে না, এই ব্যাপারটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে আমি কোনো দিন বুঝতে পারব না।

(৯) আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনে পোশাকের ব্যাপারটা সবচেয়ে সহজ, সেটা নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। যার যা খুশি করতে পারে। তাই যে যেটা পরে আরাম পায় সেটাই পরে, টি-শার্ট আর জিন্স পরে পুরো জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। (হাওয়াইয়ে আমার পরিচিত একজন বাংলাদেশের অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে গ্রীষ্মকালে ক্লাস নেয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন কারণ ছাত্রীরা বিকিনি পরে ক্লাসে চলে আসে। তবে হাওয়াইয়ের কথা আলাদা, মূল ভূখণ্ডে এত বাড়াবাড়ি নেই।) একজন সহকর্মী হঠাৎ করে মারা যাওয়ার পর তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যাওয়ার সময় স্যুট পরে যাওয়া ছাড়া অন্য কখনো আমার স্যুট-টাই পরার সুযোগ হয়েছে বলে মনে করতে পারছি না! আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতে হয় সে রকম জায়গা নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমার আঠারো বছরে প্রবাস জীবনে সে রকম জায়গায় খুব বেশি যেতে হয়নি। (কী আনন্দের কথা, দেশে ফেরার পর বাকি আঠারো বছরেও আমার সে রকম জায়গায় যেতে হচ্ছে না।)

(১০) আমাদের দেশে পান খাওয়ার একটি ব্যাপার আছে, তার সাথে জড়িত আছে পানের পিক, পান চিবুতে চিবুতে এদিক-সেদিক পিচিক করে পানের পিক

ফেলাটা প্রায় কালচারের অংশ হয়ে গেছে। (কেউ কী আমাদের সদর হাসপাতালগুলোর দেওয়ালের কোনাগুলো দেখেছে? মনে হয় সেগুলো তৈরি হয়েছে পানের পিক ফেলার জন্যে!) শুধু পানের পিক নয় চিপসের প্যাকেট, ঠোঙা, পানির খালি বোতল, চুইংগামের কাগজ, সিগারেটের গোড়া যেখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলে দেওয়াটাকে এখানে কেউ অন্যায় কিছু মনে করে না। বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে যাবার জন্যে প্লেনে ওঠার আগে এই অভ্যাসগুলো বাক্সবন্দি করে দেশে রেখে যেতে হয়। আমেরিকার কোনো রাস্তায় অন্যমনস্কভাবে একটা ঠোঙা ছুড়ে ফেলার পর যদি কোনো থুথুড়ে বুড়ি সেটা তুলে হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঠিক জায়গায় ফেলতে বলে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। (দোহাই লাগে, এ রকম কোনো অভিজ্ঞতা হলে কেউ যেন নিজের দেশের পরিচয় দিয়ে দেশের বেইজ্জতি না করে।)

দেশের বাইরে গেলে শারীরিক কিছু ব্যাপার-স্যাপারেও একটু সতর্ক থাকা ভালো। ভালো-মন্দ কিছু খেলে খাবার শেষে একটা বড়োসড়ো ঢেঁকুর তোলাটা আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। (আমি শুনেছি কোনো কোনো কালচারে খাওয়া শেষে অতিথিরা ঢেঁকুর না তুললে সেটাকে অপমান হিসেবে ধরা হয়।) তবে পশ্চিমা দেশে প্রকাশ্য জায়গায় ঢেঁকুর তোলাটা বন্ধ রাখতে হবে। হাঁচি-কাশি ঢেঁকুর এ রকম গর্হিত ব্যাপার যদি ঘটেই যায় তাহলে "এক্সকিউজ মি" বলে ক্ষমা চাইলে সবাই সেই অপরাধকে ক্ষমা করে দেয়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই সাথে আরেকটা বাক্যাংশ শিখে নেওয়া ভালো—সেটা হচ্ছে থ্যাংক ইউ। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে আমরা যদি কারো প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ অনুভব করি তারপরেও সেটা মুখ ফুটে বলি না। আমেরিকা গেলে এটা মুখ ফুটে বলা শিখে নিতে হবে। বাক্যাংশটি চমৎকার, যে বলে এবং যাকে বলা হয় দুজনেই এটা থেকে আনন্দ পেতে পারে।

(১১) আমেরিকাতে তরুণ-তরুণীরা (এবং বুড়ো-বুড়িরাও) তাদের ভালোবাসা যথেষ্ট খোলামেলাভাবে প্রকাশ করে। দুজন তরুণ-তরুণী হাত ধরাধরি করে কিংবা জড়াজড়ি করে হাঁটছে এটা খুবই পরিচিত একটা দৃশ্য। কিন্তু দুজন তরুণ (কিংবা দুজন তরুণী) পরস্পরে হাত ধরে হাঁটছে এটা মোটেও পরিচিত দৃশ্য নয়। দুজন তরুণ কিংবা দুজন তরুণী পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারে কিন্তু কখনোই তারা একে অন্যের হাত ধরে হাঁটবে না কারণ তাহলে অন্যেরা সেটাকে বিশেষ এক ধরনের সম্পর্ক হিসেবে ধরে নেবে! (কোনো লেখায় আমার নাম থাকলে বাচ্চা-কাচ্চারা সেটা পড়ে ফেলে বলে খবর পেয়েছি—তাই এই বিষয়টাকে আর বিস্তৃত করা গেল না।)

(১২) আমার এক ডজন তথ্য এবং উপদেশের শেষটাতে চলে এসেছি— আসলে এখানে যে কথাটি বলতে চেয়েছি সেটা বলার জন্যে ওপরের কথাগুলো একটি ভণিতা মাত্র! উপরের ভূমিকাটি শেষ করে এবার আমি আসল কথাটিতে চলে আসতে পারি।

আমাদের দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও সেগুলোতে সত্যিকার অর্থে গবেষণা শুরু হয়নি (শিক্ষা এবং গবেষণার জন্যে সরকার যে পরিমাণ টাকা খরচ করে সেটা একটা কৌতুকের মতো) তাই এই দেশের উৎসাহী ছেলেমেয়েরা প্রতি বছর বাইরে পিএইচডি করতে যায়। এদের অনেকে এত উৎসাহী, এত সৃজনশীল, এত প্রতিভাবান যে তাদের একটা ছোট অংশও যদি দেশে ফিরে আসত তাহলে দেশে মোটামুটি একটা বিপ্লব ঘটে যেত। কিন্তু তারা আসলে দেশে ফিরে আসে না। আমি আশায় আশায় থাকি যে কোনো দিন এই দেশের সরকার একটি দুটি ছোট বিষয় নিয়মের মাঝে নিয়ে আসবে এবং আমাদের এই উদ্যমী সোনার টুকরো ছেলেমেয়েরা দেশে ফিরে আসতে শুরু করবে। যত দিন তারা দেশে ফিরে না আসছে আমার খুব ইচ্ছে তারা অন্তত এই দেশটির কথা তাদের বুকের ভেতরে লালন করুক, এর বেশি আমার কিছু চাইবার নেই।

আমাদের দেশ থেকে যারা লেখাপড়া করতে বিদেশে গিয়ে সেখানে থেকে যায় তাদেরকে আসলে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ কখনো ভুলতে পারে না যে তারা এই দরিদ্র দেশটির মূল্যবান সম্পদ ব্যবহার করে লেখাপড়া করেছে, প্রতিদানে তারা দেশটাকে কিছু দেয়নি। দরিদ্র দেশে প্রায় বিনা মূল্যে পাওয়া শিক্ষাটুকু ব্যবহার করে আমেরিকা (বা সে রকম কোনো একটা দেশ)-কে সেবা করে যাচ্ছে। সে জন্যে তাদের ভেতর একটা অপরাধবোধ কাজ করে, তারা সবসময়ই দেশের ঋণটুকু শোধ করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করে।

আরেক ভাগ মানুষ এই অপরাধবোধ থেকে বের হওয়ার জন্যে অত্যন্ত বিচিত্র একটা উপায় খুঁজে বের করেছে, সেটা হচ্ছে সব কিছুর জন্যে নিজের দেশটাকেই দায়ী করা। তারা প্রতিমুহূর্তে দেশকে গালাগাল দেয়। তারা বড় গলায় সবাইকে জানিয়ে দেয় এই পোড়া দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ নেই, তাদের মেধা কিংবা প্রতিভা ব্যবহারের সুযোগ নেই, এই দেশে জন্ম হওয়াটাই অনেক বড় ভুল হয়েছিল, এখন আমেরিকাতে আসন গেড়ে সেই ভুল সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নিজের দেশটি কীভাবে রসাতলে যাচ্ছে তার সমস্ত পরিসংখ্যান তাদের নখদর্পণে। দেশের অবিবেচক মানুষ কীভাবে রাজনীতি করে, হরতাল দিয়ে, সন্ত্রাস করে দুর্নীতি করে পুরো দেশটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে সেটা তারা শুধু নিজেদের মাঝে নয়, বাইরের সবার সাথেও আলোচনা করে সময় কাটায়।

আমার যে ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকায় লেখাপড়া করতে যাচ্ছে তাদের এই স্বার্থপর অংশ থেকে সতর্ক থাকতে বলেছি, সম্ভব হলে একশ হাত দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছি। পৃথিবীতে যত রকম অনুভূতি আছে তার মাঝে সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি হচ্ছে ভালোবাসা। আর পৃথিবীতে যা কিছু ভালোবাসা সম্ভব তার মাঝে সবচেয়ে সেরা জিনিসটি হচ্ছে মাতৃভূমি। মাতৃভূমিটি যখন সব কিছুতে আদর্শ হয়ে উঠবে শুধু তখন তাকে ভালোবাসব যখন সেটা দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণায় জর্জরিত হবে তখন তাকে ভালোবাসব

না, সেটা তো হতে পারে না। যেসব হতভাগারা নিজের দেশকে ভালোবাসার সেই মধুর অনুভূতি কখনো অনুভব করেনি আমি আজকাল তাদের জন্যে করুণাও অনুভব করি না।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি যখন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে গিয়েছিলাম তখন আমি ছিলাম সেখানকার একমাত্র বাংলাদেশি (দ্বিতীয় বাঙালি হিসেবে যে ছাত্রীটি এসেছিল ঝটপট তাকেই আমি বিয়ে করে ফেলেছিলাম।), এখন সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে আমেরিকার যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনেক বাঙালি আছে—খাঁটি বাংলাদেশের বাঙালি।

মাতৃভূমি ছেড়ে প্রবাসী হওয়ার পর বাংলাদেশের সেই মানুষগুলোই হয়ে ওঠে পরিবারের মানুষ, হয়ে ওঠে আপনজন। সুখে-দুঃখে তারা পাশে থাকে, যখন দেশকে তীব্রভাবে মনে পড়ে তখন এই দেশের মানুষগুলোই তাদের সান্ত্বনা দেয়।

তখন কিন্তু একটা খুব বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সুখে-দুঃখে তাৎক্ষণিকভাবে শুধু বাংলাদেশের মানুষকে নিয়েই সময় কাটাবে নাকি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আসা ভিন্ন ভিন্ন কালচারের মানুষগুলোর সাথেও একটা আন্তরিক সম্পর্ক করে তুলবে? যারা শুধুমাত্র বাংলাদেশের বাঙালিদের সাথেই গল্পগুজব, আড্ডা, রাজনীতি কিংবা অনেক সময় দলাদলি করে সময় কাটায় তারা কিন্তু অনেক বিশাল একটা ক্যানভাসে নিজের জীবনটাকে বিস্তৃত করার একটা চমৎকার সুযোগ হারায়। একটা দেশের গণ্ডি থেকে বের হয়ে একটা পৃথিবীর গণ্ডির মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ কিন্তু অনেক বড় সুযোগ। কেউ যখন প্রথমবার আবিষ্কার করে গায়ের রং, মুখের ভাষা, ধর্ম, কালচার সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও সবাই যে হুবহু একই রকম মানুষ সেটি অসাধারণ একটি অনুভূতি।

কাজেই আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের বারবার করে বলেছি তারা যেন নিজের দেশের মানুষের পাশাপাশি আমেরিকার মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভিন্ন কালচারের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যটা যেন উপভোগ করে। তারা যেন হাইকিং করে, জগিং করে, ক্যাম্পিং করে, হাজার হাজার মাইল ড্রাইভ করে ঘুরে বেড়ায়, গাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে বনেট খুলে ঠিক করে ফেলতে শেখে, তারা যেন তুষারে ঢাকা পাহাড়ে ওঠে, সমুদ্রের নিচে স্কুবা ডাইভিং করে, ছবি আঁকতে শেখে, গান গাইতে শেখে, মিউজিয়ামে যায়, অপেরা দেখে, কনসার্টে যায়, এককথায় যে বৈচিত্র্যময় কাজগুলো কখনো করার সুযোগ পায়নি সেগুলো করে জীবনটাকে উপভোগ করে। (কেউ কী বিশ্বাস করবে আমার মতো একজন মানুষ পর্বতারোহণের ট্রেনিং নিয়ে আইস এক্স আর ক্লাইম্বিং রোপ হাতে তুষারে ঢাকা পাহাড়ে উঠে বরফের ওপর ক্যাম্প করে স্লিপিং ব্যাগে ঘুমিয়েছি? পর্বতের চূড়ায় উঠে উল্লসিত হয়েছি?)

কোনো কিছু থেকে কি সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে? আগে ছিল না, এখন আছে। নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্র কাজী নাফিসের ঘটনাটি হচ্ছে তার উদাহরণ। এই দেশের যুদ্ধাপরাধীদের চেলাচামুণ্ডারা সেই দেশে আজকাল খুবই সক্রিয়। আমেরিকার

সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে তারা শুধু নিজেরা থাকে না তাদের আগে-পেছনের কয়েক প্রজন্মকে সেই দেশে নিয়ে চলে যায় কিন্তু দেশটিকে তারা মনে করে কাফিরদের দেশ। ভিন্ন ধর্মের জন্যে অবজ্ঞা দেখিয়ে যখন কেউ কাফিরদের দেশে থাকার কলাকৌশল শেখাতে এগিয়ে আসবে তাদের থেকে সাবধান। ভিন্ন ধর্ম আর ভিন্ন কালচার মানে খারাপ ধর্ম আর খারাপ কালচার নয়। ভিন্ন মানে বৈচিত্র্য আর বৈচিত্র্য হচ্ছে সৌন্দর্য। এটা যত তাড়াতাড়ি জানা যায় ততই ভালো। যারা জানে না তারা নূতন পৃথিবীর মানুষ নয়—তাদের থেকে সাবধান।

আর সেই দেশে দীর্ঘদিন থেকে লেখাপড়া শেষ করে জীবনকে উপভোগ করে কখনো যদি দেশের জন্যে বুক টনটন করে তখন কী করতে হবে?

তখন তারা আবার এই দেশটাতে ফিরে আসতে পারবে। মা যেমন করে তার সন্তানের জন্যে অপেক্ষা করে দেশমাতৃকাও ঠিক সে রকম করে তার সন্তানের জন্যে গভীর ভালোবাসা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে।

আমি বাড়িয়ে বলছি না–আমি এটা জানি।

[সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৩ এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

অস্ট্রেলিয়ায় ঝটিকা সফর

১.

যখন বয়স কম ছিল তখন দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর একটা শখ ছিল, এখন আর সেই শখ নেই। পৃথিবীর নানা বিচিত্র দেশ থেকে নিজের সাদামাটা দেশটাকেই বেশি ভালো লাগে। তবে আমি বিষুবরেখা পার হইনি, তাই দক্ষিণ গোলার্ধের রাতের আকাশের নক্ষত্ররাজি দেখতে কেমন লাগে সেটা নিয়ে একটা সূক্ষ্ম কৌতূহল ছিল। আকাশের নক্ষত্রদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল একাত্তরে। বিনিদ্র রাতে যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম তখন মনে হতো সেগুলো বুঝি গভীর মমতা নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। দক্ষিণ গোলার্ধে গিয়ে আকাশের দিকে তাকালে আরো নূতন নক্ষত্রের সাথে পরিচয় হতো। তা ছাড়া রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি দক্ষিণ গোলার্ধে একটা ভিন্ন সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দেয়, সেটা দেখারও আগ্রহ ছিল। তাই যখন অস্ট্রেলিয়ার বাংলা সাহিত্য সংসদ আমাকে মেলবোর্নে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আমি যেতে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভীতু ধরনের মানুষ, একা ভ্রমণ করতে সাহস পাই না। তাই যখন আমার স্ত্রী সাথে যেতে রাজি হলো তখন শেষ পর্যন্ত প্লেনে চড়ে বসলাম।

মেলবোর্ন পৌঁছানোর পর একটি অত্যন্ত অভিজাত ধরনের বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া কুকুর আমাদের সব কিছু শুঁকে যখন অনুমতি দিল যে আমরা অস্ট্রেলিয়ায় পা দিতে পারি তখন আমরা বের হয়ে এলাম। আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে মেলবোর্নের বাংলা সাহিত্য সংসদের প্রায় সব সদস্য এয়ারপোর্টে চলে এসেছেন, তারা আমার সাথে এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন আমি খুব বড় একজন সাহিত্যিক এবং আমার সন্দেহ হতে শুরু করল যে আমি ভুল জায়গায় চলে এসেছি কী না!

বাংলা সাহিত্য সংসদ বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের একটা সংগঠন। বিদেশের মাটিতে যারা থাকেন দেশের জন্যে তাদের ভিন্ন এক ধরনের মায়া থাকে।

যারা কখনো দেশ ছেড়ে যাননি তারা আসলে কখনো দেশের জন্যে এই বিচিত্র মায়াটি অনুভব করতে পারবেন না। দেশের প্রতি এই মমত্ববোধ থেকে বাংলা সাহিত্য সংসদ মেলবোর্ন শহরে নানা কিছুর আয়োজন করে থাকে, তার একটি হচ্ছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলা থেকে সাহিত্যিকদের নিয়ে আসা। তাদের আয়োজনে সুনীল-শীর্ষেন্দু-সমরেশ মজুমদারের মতো সাহিত্যিকেরা এসেছেন এবং সেই একই আয়োজনে আমিও চলে এসেছি। নিজের সাহস দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম!

দেশে আমাকে নানা অনুষ্ঠানে যেতে হয়, শিক্ষকতা করি তাই কথা বলাই আমার কাজ, সে জন্যে বক্তৃতা দিতেও আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যিক হিসেবে শত শত মানুষের সামনে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য দেওয়া? এটি আমার জন্যে হবে পুরোপুরি নূতন অভিজ্ঞতা। বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্যে বানিয়ে বানিয়ে গালগল্প লিখি, কিন্তু সেটা তো আর সাহিত্য নয়, কিন্তু সেটা কাকে বোঝাব?

সাহিত্য-সভাটি শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছিল। শিক্ষক হওয়ার কিছু বিশেষ সুবিধা আছে, সারা পৃথিবীতেই আমার ছাত্রছাত্রী। এখানেও তারা অনেকে, সবাই দল বেঁধে চলে এলো। বক্তব্যের শেষে একটা প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল, আয়োজকরা সেটা নিয়ে একটু দুর্ভাবনায় ছিলেন। এটি নূতন শুরু হয়েছে, রাজাকার টাইপের মানুষেরা দেশে সুবিধে করতে পারে না। বিদেশে সভা-সমিতিতে এসে নাকি যা কিছু করে ফেলতে পারে। আমি আয়োজকদের অভয় দিলাম রাজাকার টাইপের মানুষদের কেমন করে সামলাতে হয় সেটি নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ কবিতা পর্যন্ত লিখে গেছেন, "...যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে/পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।"

কিন্তু সে রকম কিছুই হলো না। সাহিত্য থেকে দর্শক-শ্রোতার বেশি আগ্রহ ছিল শিক্ষা নিয়ে, দেশ নিয়ে, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এগুলো আমারও প্রিয় বিষয়, দেশ নিয়ে সব সময় স্বপ্ন দেখি, সেই স্বপ্নের কথা দশজনকে বলতে আমার কখনো সমস্যা হয় না। (তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যখন একজন দর্শক আমার কাছে জানতে চাইল আমি কেন গোঁফ রাখি–আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। আমি কিছু বলার আগেই আমার স্ত্রী যখন হলভরা মানুষকে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল তখন আমার মুখ দেখানোর উপায় নেই!)

বাংলা সাহিত্য সংসদের আনুষ্ঠানিক সাহিত্য সভাটি ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার কিন্তু আমরা সংসদের সদস্যদের সাথে ঘরোয়া পরিবেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে সময় কাটিয়েছি। প্রতিরাতেই কারো বাসায় সবাই একত্র হয়েছে এবং আমরা বাঙালিরা যে কাজগুলো খুব ভালো পারি—খাওয়া এবং চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া, অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেগুলো করা হয়েছে। যে মানুষগুলোকে আগে কখনো দেখিনি তাদের থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সবার চোখে পানি—এ রকম বিচিত্র ঘটনা বাঙালি ছাড়া অন্য কোনো মানুষের জীবনে ঘটেছে কি না, আমার জানা নেই। মাঝে মাঝেই মনে হয়, ভাগ্যিস বাঙালি হয়ে জন্মেছিলাম, তা না হলে কত কিছু যে অজানা থেকে যেত!

২.

মেলাবোর্ন শহর পৃথিবীর সবচেয়ে বাসযোগ্য শহর। আমি সেখানে গিয়েছি ঢাকা শহর থেকে, যারা বাসযোগ্য শহরের সার্টিফিকেট দেন তারা ঢাকা শহরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বাসের অযোগ্য শহরের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। (আসলে ঢাকা শহর দুই নম্বর, এক নম্বর বাসের অযোগ্য শহর হচ্ছে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কাস। সেখানে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে মানুষ মারা হয়, যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত একটি শহর, এ রকম একটা শহরের সাথে প্রতিযোগিতা করা সোজা কথা নয়। আমার ধারণা, যারা বাসের অযোগ্যতার সার্টিফিকেট দেন তারা মে মাসের ৫ তারিখে ঢাকা শহরে হেফাজতে ইসলামের তাণ্ডব দেখার সুযোগ পেলে প্রথম পুরস্কারটা নির্ঘাৎ দামেস্কাসকে না দিয়ে ঢাকা শহরকে দিয়ে দিতেন।)

যে কয়দিন মেলবোর্নে ছিলাম তখন বোঝার চেষ্টা করেছি এই শহরটি কেন সবচেয়ে বাসযোগ্য শহরের পুরস্কার পেয়েছে। বাসযোগ্য শহর হতে হলে মানুষকে বাস করতে হবে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেলবোর্নের পথেঘাটে মানুষই চোখে পড়েনি! পুরো দেশেই মানুষ মাত্র দুই কোটি (এবং এটি শুধু দেশ নয়—মহাদেশও বটে।) তাই চারিদিক ফাঁকা। শহরে উঁচু বিল্ডিং নেই, ছোট ছোট খেলনার মতো বাসা, বাসাগুলো ক্যালেন্ডারের ছবির মতো। বাসযোগ্য শহরের সার্টিফিকেট ঠিক কী কী কারণে পেয়েছে জানা নেই। তবে বৈচিত্র্যে এই শহরটি অভিনব। দক্ষিণ গোলার্ধ বলে এখানে সব কিছু উল্টো। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শীত আসছে, সেখানে শীত শেষ হয়ে গ্রীষ্ম আসছে। তবে মনে হলো গ্রীষ্ম আসার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। এখানে প্রচুর শীত, রাতে লেপ মুড়ি দিয়ে হিটার জ্বালিয়ে ঘুমাতে হয়। মেলবোর্ন শহরে একই দিনে কখনো প্রচণ্ড গরম, কখনো কনকনে শীত, কখনো বৃষ্টি আবার কখনো উথাল-পাথাল হাওয়া। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মানুষজন নাকি চারটি ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বের হয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বাসের অযোগ্য (প্রায়) শহর থেকে সবচেয়ে বাসযোগ্য শহরে পা দেওয়া নিঃসন্দেহে একটা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। তবে বলে রাখি, ঢাকা ফিরে আসার পর যখন প্লেন থেকে নেমেছি, আগুনের ভাপের মতো দুঃসহ গরমের একটা ঝাপটা অনুভব করেছি। হরতালের মাঝে বাসায় ফিরে এসেছি, এসে দেখি বাসায় পানি নেই—এর মাঝে হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল, অন্ধকারে মশাদের সে কী আনন্দ, আমাদের ঘিরে তাদের মহোৎসব! কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমার এতটুকু বিরক্তি অনুভব হলো না। বরং মনে হলো, আহা! ঢাকার মতো এ রকম ভালোবাসার শহর কয়টি আছে পৃথিবীতে?

৩.
আমেরিকা গেলে মানুষ যে রকম নায়েগ্রা ফলস্ না দেখে ফিরে আসে না ঠিক সে রকম অস্ট্রেলিয়া গেলে মানুষ ক্যাঙ্গারু না দেখে ফিরে আসে না। যখন অস্ট্রেলিয়া ছিলাম তখন আমাদের ক্যাঙ্গারু দেখার শখ পূরণ করিয়ে দিয়েছিল জীববিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী। (আবেদ চৌধুরী আর তার স্ত্রী টিউলিপ আমাদের দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু। আমরা আমরিকাতে এক ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি-এর জন্যে কাজ করেছিলাম। অস্ট্রেলিয়া এসে তার সাথে দেখা না করে ফিরে যাওয়া যে কোনো হিসেবেই অপরাধ।) ক্যানবেরা এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় যেতে যেতে দেখলাম পথের দুই পাশে ক্যাঙ্গারু। রাতের অন্ধকারে গাড়ির ধাক্কা খেয়ে মারা পড়েছে। জীবিত না হোক তবুও তো ক্যাঙ্গারু—আমি এতেই সন্তুষ্ট ছিলাম কিন্তু আবেদ চৌধুরী আমাদের জীবিত ক্যাঙ্গারু না দেখিয়ে ছাড়বে না। তাই পরদিন কয়েক ঘণ্টা ড্রাইভ করে আমাদের নিয়ে এক জায়গায় হাজির হলো; সেখানে পথের দুই পাশে অসংখ্য ক্যাঙ্গারু। আমাদের দেশের এমপিরা যখন তাদের এলাকায় যান তখন স্কুলের হেড মাস্টাররা যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের ধরে এনে রাস্তার দুই পাশে রোদের মাঝে দাঁড়া করিয়ে রাখেন, ক্যাঙ্গারুরা ঠিক সেভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা যে রকম বিস্ময় নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, মনে হলো তারাও সেই একই রকম বিস্ময় নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে! ক্যাঙ্গারুর চলাফেরা খুব মজার, তাদের মতো লেজে ভর দিয়ে জোড়া পায়ে লাফিয়ে আর কোনো প্রাণী ছুটতে পারে না। তার থেকেও মজার হচ্ছে, ক্যাঙ্গারু মায়ের পেটের থলেতে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চারা বসে থাকে। বাচ্চাগুলোকে দেখে মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি এর থেকে আরামের কোনো জায়গা নেই।

ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী, সব দেশের এম্বেসি কিংবা হাই কমিশন এখানে। এগুলোর পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার পাশে অপূর্ব একটা বিল্ডিং। চাঁদ-তারা আঁকা লাল পতাকা দেখে বুঝতে পারলাম এটা তুরস্কের হাই কমিশন। টিউলিপ আমাদের বলল, এই জমিটুকু বাংলাদেশকে দেওয়া হয়েছিল এবং শেখ হাসিনা এখানে বাংলাদেশ হাই কমিশন তৈরি করার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর বসিয়ে গিয়েছিলেন। পরের বার বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগের আমলে বসানো ভিত্তিপ্রস্তরে যেন বিল্ডিং তোলার অপমান সহ্য করতে না হয় সে জন্যে জমিটুকু হাতছাড়া হতে দিয়েছে। তথ্যটি বিচিত্র হলেও অবিশ্বাস্য নয়, দেশের তথ্য পাচার হয়ে বাইরে যেন চলে না যেতে পারে সে জন্য এই সরকার একবার বিনি পয়সায় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়ার সুযোগটি হাতছাড়া করে পুরো দেশের মানুষকে ইন্টারনেট থেকে বঞ্চিত করেছিল!

ক্যানবেরার অসংখ্য এম্বেসি এবং হাই কমিশনের মাঝে সবচেয়ে চমকপ্রদ এম্বেসিটি একটা তাঁবুর মাঝে। তাদের পুরনো পার্লামেন্ট ভবনের সামনে সেই দেশের আদিবাসীরা তাদের নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্যে বিশাল একটা পতাকা উড়িয়ে তাঁবুর মাঝে নিজেদের এম্বেসি বসিয়ে রেখেছে। সরকার তাদের ঘাঁটায়নি,

বছরের পর বছর সেভাবেই রয়ে গেছে। আমি তাদেরকে দেখে আমার নিজের দেশের আদিবাসীর কথা স্মরণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। সেনাবাহিনী যেন জাতিসংঘের লোভনীয় চাকরি নিরবচ্ছিন্নভাবে উপভোগ করতে পারে সে জন্যে এই দেশের আওয়ামী লীগ সরকার ঘোষণা দিয়ে রেখেছে এই দেশে আদিবাসী বলে কিছুই নেই। এর চাইতে মমত্বহীন কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাও মমত্বহীনতার স্বাদ অনেক দিন থেকে পেয়ে এসেছে। সাদা চামড়ার মানুষেরা প্রথম যখন এই দেশ দখল করেছে তখন তারা ফুর্তি করার জন্যে মানুষ যেভাবে পাখি শিকারে যায়, তারা সেভাবে আদিবাসী শিকারে যেত। কেউ কোনো আদিবাসীর মাথা কেটে আনতে পারলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হতো। মাত্র কিছুদিন আগেও আদিবাসী মায়ের বুক খালি করে আদিবাসী সন্তানদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অতীতের এই নিষ্ঠুরতার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার জনগণ আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেন্টে আদিবাসীদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু এত দিনে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার এই বিশাল ভূখণ্ডে সত্যিকার অধিবাসীদের কোনো চিহ্ন বলতে গেলে নেই—সারা পৃথিবীতে এ রকম নিষ্ঠুরতার উদাহরণ এত বেশি যে মনে হয় এটাই বুঝি নিয়ম। সব কিছু কেড়ে নিয়ে কোনো একসময়ে ক্ষমা চেয়ে নিজেদের পিঠে নিজেরাই নৈতিকতার একটা সিল মেরে দেওয়া!

৪.

আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রী অস্ট্রেলিয়া থাকে। আমরা মেলবোর্ন এসেছি শুনে অনেকেই দেখা করতে এসেছে। একসময়ে তারা কমবয়সী ছাত্র কিংবা ছাত্রী ছিল, এখন তারা বড় হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বামী আছে, স্ত্রী আছে, ফুটফুটে ছেলেমেয়ে আছে, দেখে বড় ভালো লাগল। শুধুমাত্র আমাদের সাথে দেখা করার জন্যে কেউ শত শত কিলোমিটার থেকে ড্রাইভ করে এসেছে, কেউ কেউ প্লেনে উড়ে এসেছে। তাদের নিয়ে হাজারো রকমের স্মৃতিচারণা করতে করতে রাত রাত পার হয়ে যাওয়ার অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঘটনাগুলোর অনেক কিছুই ছিল মোটামুটি ভয়ংকর, এখন হঠাৎ করে সেগুলোই মনে হয় মজার, শুনে সবাই হেসে গড়াগড়ি খায় সে রকম অবস্থা। আমরা যখন গিয়েছি তখন সবেমাত্র ইলেকশন শেষ হয়েছে। সেই দেশে সবাইকে ভোট দিতে হয়—ভোট না দিলে সত্তর ডলার জরিমানা। একজন বলল, ইলেকশনের খবর পেয়ে তার মা খুব ব্যস্ত হয়ে দেশ থেকে তাকে ফোন করে বলেছেন, বাবা ইলেকশনের দিন খবরদার ঘর থেকে বের হবি না। কখন কোথায় কী বিপদ হয়! শুনে আমরা সবাই হেসেছি কিন্তু তার মাঝেও বুকের মধ্যে কোথায় জানি একটা ব্যথার খোঁচা অনুভব করেছি—আমাদের দেশেও ইলেকশন আসছে কিন্তু সেটা নিয়ে আমাদের সবার মাঝে কী ভয়ানক অনিশ্চয়তা, কী হয় সেটা ভেবে কী একটা অসহায় আতঙ্ক।

খুব অল্প সময়ের জন্যে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম, তাই আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের খুব বেশি সময় দিতে পারিনি কিন্তু তার মাঝেই তারা সবাইকে নিয়ে

দলবেঁধে সমুদ্রোপকূলে বনে-জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে চলে গেল। যত ধরনের বেড়ানো আছে তার মাঝে সবচেয়ে মজার বেড়ানো হচ্ছে যখন নিজেদের কিছু করতে হয় না; অন্যেরা সব কিছু করে দেয়। তারা যদি ছাত্রছাত্রী হয় তাহলে তো কথাই নেই! (মজার ব্যাপার হচ্ছে, দেশে ফিরে আসার পর দেখি আমরা কখন কোথায় কী করেছি, তার সব কিছু সবাই জানে। ফেসবুকের কল্যাণে কিছু ঘটার আগেই সেই ঘটনার কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এরকম একটা কিছু যে হতে পারে আমরা কি অল্প কিছুদিন আগেও জানতাম? ভবিষ্যতে আরো কিছু কী ঘটতে পারে যেটা এখন আমরা কল্পনাও করতে পারছি না?)

৫.

যারা এই লেখাটি পড়ছে তারা নিশ্চয়ই আবিষ্কার করে ফেলেছে আসলে এখানে অস্ট্রেলিয়ার কোনো কথা নেই। এখানে সব কথা অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী বাঙালিদের কথা! আসলে কেউ যদি কয়েক দিনের জন্যে কোনো দেশে যায় তাহলে সেই দেশকে সত্যিকার অর্থে অনুভব করার কোনো সুযোগ থাকে না। একটা দেশকে অনুভব করতে হলে সেই দেশে দীর্ঘদিন থাকতে হয়। তখন সেই দেশের বাহ্যিক চকচকে দৃশ্যের পেছনে গ্লানিগুলো চোখে পড়ে, ব্যর্থতাগুলো দেখা যায়।

যারা সেই দেশে থাকেন তাদের কাছে একটা তথ্য পেয়েছি, যেটা আমাকে অবাক করেছে। স্কুলের লেখাপড়া নিয়ে অভিভাবকদের মাঝে একধরনের হতাশা, হতাশার মূল কারণ সেখানে যথেষ্ট ভালো শিক্ষক নেই। শিক্ষকের বিশেষ অভাব বিজ্ঞান, গণিত এসব বিষয়ে। সমস্যার সমাধান হবে সে রকম আশাও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রছাত্রী নেই, প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়েই এই বিষয়গুলোই তুলে দেওয়া হচ্ছে! শুনে মনে হয় হুবহু আমাদের দেশের কাহিনী। এত সম্পদ নিয়েও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ হিমশিম খাচ্ছে তাহলে আমরা কেন অভিযোগ করছি? শিক্ষার পেছনে জিডিপির মাত্র ২.২ শতাংশ খরচ করে আমরা তো খুব খারাপ করিনি! আর একটু বেশি হলে না জানি কী হতো! অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা দুই কোটি আর আমাদের দেশে স্কুলেই পড়ে তিন কোটি বাচ্চা-কাচ্চা। সরকার যদি লেখাপড়ার গুরুত্বটা বুঝে সেনাবাহিনীর বাজেট না বাড়িয়ে শিক্ষার বাজেট বাড়াত তাহলে এই দেশে কী বিপ্লব ঘটে যেতে পারত কেউ কী কখনো কল্পনা করে দেখেছে?

৬.

শুরুতে বলেছিলাম বিষুবরেখা অতিক্রম করার একটা উদ্দেশ্য ছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি দেখা। সেটা দেখে এসেছি—কী চমৎকার সেই নক্ষত্র। মনে হচ্ছে গভীর মমতা নিয়ে সেটি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

[সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা

কয়েক বছর আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে একটা ছেলে গাড়ি একসিডেন্টে মারা গিয়েছিল। আমি এই ঘটনাটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। শুধু মনে হয় কোনো দূর এক শহর থেকে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে এত দূরে তাকে টেনে আনার জন্যেই হয়তো তাকে এত অল্প বয়সে মারা যেতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার নামে সবাই মিলে যে ভয়ংকর একটি হৃদয়হীন পদ্ধতি দাঁড় করিয়ে রেখেছে সেই পদ্ধতিটিই কী কোনোভাবে এর জন্যে দায়ী নয়? আবার ভর্তি পরীক্ষা আসছে, আমি জানি হাজার হাজার ছেলেমেয়ে তাদের অভিভাবকদের নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াবে। খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম দূরে থাকুক অনেক জায়গায় তাদের একটা বাথরুমে যাওয়ার সুযোগ পর্যন্ত থাকবে না।

অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিল না, খুব সহজেই ছাত্রছাত্রীদের এই ভয়ংকর অমানবিক ভোগান্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার সুযোগ ছিল। বাংলাদেশের সব কয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি রাজি হতো তাহলে খুব সহজেই সবাই মিলে একটি (হ্যাঁ, মাত্র একটি) চমৎকার মানসম্মত ভর্তি পরীক্ষা নিয়েই এই দেশের সব ছাত্রছাত্রীকে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে বিবেচনা করতে পারত।

এই সরকার আসার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ডেকে সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষার একটি উদ্যোগ নিয়েছিল। সেখানে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিষয়টির সম্ভাব্যতা নিয়ে একটা বক্তব্য দিতে। আমি একটু গাধা প্রকৃতির মানুষ, তাই সরল বিশ্বাসে সকল তথ্য-উপাত্ত নিয়ে হাজির হয়েছিলাম—বক্তব্য শুরু করার আগেই অবশ্যি টের পেয়েছিলাম আমার সেখানে হাজির হওয়াটাই বড় ধরনের নির্বুদ্ধিতা হয়েছে! সেখানে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররা আসেন দেরি করে এবং চলে যান সবার আগে।

যাওয়ার আগে বলে যান যে তাদের বহুল পরীক্ষিত একটা ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে সেটা নড়চড় করার কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। গুরুত্বপূর্ণ ভাইস চ্যান্সেলররা বলেন যে তারা কঠিন নিরাপত্তার মাঝে ভর্তি পরীক্ষা নেন, সবাই মিলে পরীক্ষা নিলে তাকে কে সেই নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে? একজন ভাইস চ্যান্সেলর খোলাখুলি বলেই ফেললেন, তিনি যদি সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষার মতো একটা প্রস্তাব নিয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান তাহলে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। বেশিরভাগ ভাইস চ্যান্সেলররা অবশ্যি আমার বক্তব্যের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলেন না কিংবা বোঝার চেষ্টাও করলেন না। আমার ছেলেমানুষি বক্তব্য শুনে হতাশভাবে মাথা নাড়তে থাকলেন।

শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজের মতো করে ভর্তি পরীক্ষা নিতে থাকল। আমার ধারণা বিষয়টা আরো খারাপ হলো। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মনে হয় প্রায় রাগ করেই ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যে নির্ধারিত পরীক্ষার দিনগুলোতে ইচ্ছেমতো তাদের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ফেলতে লাগল এবং বাধ্য হয়ে ছোট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শেষ মুহূর্তে তাদের পরীক্ষার তারিখ পাল্টাতে বাধ্য হতে থাকল। আমি জানি আমাদের– পরপর দুই বছর কুয়েট-এর সাথে একই দিনে পরীক্ষা নিতে হয়েছে। যেসব ছেলেমেয়ে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ার আগ্রহ ছিল, তারা মন খারাপ করে ক্ষুব্ধ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটিতেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে।

কিছুদিন আগে ইউ.জি.সি. থেকে আবার সকল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্যতা আলোচনা করার জন্যে সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ন্যাড়া দুইবার বেলতলায় যায় না কিন্তু এটি আমার প্রিয় বেল, তাই ন্যাড়া হয়েও আবার বেলতলায় গিয়েছিলাম। আমি এবারে খানিকটা কৌতুক এবং অনেকখানি বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করলাম সব বিশ্ববিদ্যালয়ই সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষার পক্ষে বক্তব্য দিলেন। শুধু তা-ই নয়, কখন, কীভাবে এই পরীক্ষাটি নেওয়া যায় সেই খুঁটিনাটি নিয়েও দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হলো এবং আমি যেহেতু নির্বোধ প্রকৃতির তাই আবার একটু আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম!

দেখতে দেখতে আবার ভর্তি পরীক্ষার সময় এসেছে এবং দেখা গেল অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, সব বিশ্ববিদ্যালয়েই তাদের নিজেদের ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে। কেউ কেউ বরং উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করেছেন, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় সন্তুষ্ট না থেকে প্রত্যেকটা বিভাগের জন্যে আলাদা আলাদা ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। এই দেশের হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীদের পীড়ন করার জন্যে এর চাইতে নির্মম কিছু আবিষ্কার করা যায় কি না, আমার সেটি জানা নেই।

এই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির কোনোই পরিবর্তন হয়নি সেটি অবশ্যি পুরোপুরি সত্যি নয়, খুব ছোট একটা পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনটা এত ছোট

যে হয়তো কারো চোখেই পড়বে না কিন্তু আমার ধারণা পরিবর্তনটা গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি খুলে বলা যাক :

কিছুদিন আগে যশোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে তাদের সমাবর্তন-বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। (আমার জন্যে সেটি ছিল অনেক বড় একটা দায়িত্ব এবং অবশ্যই অনেক বড় সম্মান।) সমাবর্তনের পুরো অনুষ্ঠান শেষ করে যখন ফিরে আসছি তখন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর আমাকে বললেন, "আমরা তো অনেক দিন থেকেই সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে একটা ভর্তি পরীক্ষার জন্যে চেষ্টা করে আসছি। কথাবার্তা হচ্ছে কিন্তু কোনো কাজ তো হচ্ছে না। শুধু আমরা আর আপনারা মিলে একটা যৌথ ভর্তি পরীক্ষা নিলে কেমন হয়? একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় মিলে যে একটা ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া যায় তার একটা উদাহরণ তৈরি হোক!" আমি বললাম, "চমৎকার আইডিয়া। আপনার প্রস্তাবটা আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাব, দেখি সবাইকে রাজি করানো যায় কি না।"

নিজেদের প্রশংসা করা ঠিক না, তারপরেও বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ভবিষ্যৎমুখী, অনেক আধুনিক। যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবটা আমাদের একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপন করা মাত্রই সবাই সেটি আগ্রহে লুফে নিল। আমি সেটি যশোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে জানালাম এবং তখন তারা খুঁটিনাটি আলাপ-আলোচনা করার জন্যে তাদের কয়েকজন ডিন, বিভাগীয় প্রধান, সিনিয়র শিক্ষক, তরুণ প্রযুক্তিবিদ নিয়ে সারারাত গাড়ি চালিয়ে যশোর থেকে সিলেটে হাজির হয়ে গেলেন।

সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষার জন্যে আমরা যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেটি এমনভাবে দাঁড়া করানো হয়েছে যেন এর কারণে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কেই তাদের প্রচলিত কোনো নিয়মকেই পরিত্যাগ করতে হবে না। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পুরোপুরি বজায় রেখেই এই সুযোগটি নিতে পারবে। সেটি সম্ভব হয়েছে তার কারণ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগের বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় না। ঘুরেফিরে সব সময়েই ছাত্রছাত্রীর এইচএসসির বিষয়গুলোর ওপর পরীক্ষা নেওয়া হয়। অর্থাৎ যে ছাত্রটি কম্পিউটার সায়েন্স কিংবা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্যে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, তাকে তার কম্পিউটার সায়েন্স বা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তার জ্ঞানের পরীক্ষা করা হয় না। পরীক্ষা করা হয় তার এইচএসসির পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়ে। যদি এইচএসসির পরীক্ষাটি সত্যি সত্যি ছাত্রছাত্রীর সত্যিকারের মেধা যাচাই করতে পারত এবং ফলাফল মাত্র কয়েকটা গ্রেডের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলা না হতো তাহলে আলাদাভাবে আমাদের কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ারই প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু আমরা এইচএসসি পরীক্ষাটুকুর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারি না তাই সেই এইচএসসির বিষয়গুলোরই নূতন করে নিজেদের মতো করে পরীক্ষা নিই। কাজেই সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষার মূল ধারণাটি হচ্ছে, এইচএসসি পর্যায়ের প্রয়োজনীয়

বিষয়গুলোর পরীক্ষা নিয়ে নেওয়া—তারপর যে বিশ্ববিদ্যালয় যে বিষয়ের মার্কস্ যেভাবে ব্যবহার করতে চায় তাদেরকে সেভাবে ব্যবহার করতে দিয়ে মেধা তালিকা তৈরি করে দেওয়া হবে। একসময়ে এটা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল, কম্পিউটারের কারণে এখন এটা পানির মতো সোজা। এটি যুগান্তকারী নূতন কোনো ধারণা নয়, SAT বা GRE-তে ঠিক এ রকমভাবেই পরীক্ষা নেওয়া হয়। আমাদের একটা বাড়তি সুবিধে রয়েছে, টেলিটক মোবাইল টেলিফোনের কারণে ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি বা এইচএসসির মার্কসগুলো সরাসরি পেয়ে যাই। ভর্তি পরীক্ষায় নম্বরের সাথে সাথে যে বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে এই মার্কস ব্যবহার করতে চায় তারা সেভাবে সেটি করতে পারবে। (আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম যখন শুধু একটি এসএমএস দিয়ে রেজিস্ট্রেশনের পুরো প্রক্রিয়া শেষ করার পরিকল্পনা করেছিলাম তখন বনেদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের অনেকবার ভয়-ভীতি দেখিয়েছিল, এখন দেখি তারাও আনন্দের সাথে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে যাচ্ছে!)

একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় এক সাথে পরীক্ষা নেওয়ার একটা বড় সুবিধে হচ্ছে, ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করার সময় শুধুমাত্র একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহযোগিতা নিয়ে খুশি থাকতে হবে না, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বসে প্রশ্ন তৈরি করতে পারবেন। সে জন্যে হয়তো তাদের দুই-এক দিন এক সাথে বসতে হবে কিন্তু কোনো শিক্ষকেরাই সেটা করতে আপত্তি করবেন না।

এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হলে সবচেয়ে বড় লাভ হবে ছাত্রছাত্রীদের। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সারা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে, যার অর্থ সারা দেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসতে হয়। এই বছর তাদের কষ্ট অনেক কমে যাবে। সেই উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট করে সিলেট আসতে হবে না, তারা কাছাকাছি যশোর ক্যাম্পাসেই পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারবে। ঠিক সে রকম সিলেট এলাকার কোনো ছাত্রছাত্রী যদি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় তাকে আর কষ্ট করে যশোর যেতে হবে না, তারা সিলেটে বসে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারবে! একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো বিভাগের জন্যে বিবেচিত হতে পারবে।

আমাদের এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নভেম্বরের শেষে (৩০ নভেম্বর) কিন্তু রেজিস্ট্রেশনে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আমাদের তরুণ শিক্ষকরা সব কিছু গুছিয়ে রেখেছে, আমরা ইচ্ছে করলেই নেটে দেখতে পারি কতজন এখন পর্যন্ত এই দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে রেজিস্ট্রেশন করেছে। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শেষ হতে এখনো কয়েক সপ্তাহ বাকি। এর মাঝে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি দশজনের মাঝে একজনই ঠিক করেছে তারা যশোরে বসে সিলেটের জন্যে কিংবা সিলেটে বসে যশোরের জন্যে ভর্তি পরীক্ষা দেবে। যার অর্থ ভর্তি পরীক্ষার সময় বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকদের দেশের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় না ঘুমিয়ে

না খেয়ে না বিশ্রাম নিয়ে আসতে হবে না। ভবিষ্যতে যদি আমাদের এই উদ্যোগের সাথে আরো বিশ্ববিদ্যালয় যোগ দেয় তাহলে কী চমৎকার একটা ঘটনাই না ঘটবে।

২.

আমাদের বিশ্বাস আমরা যে উদ্যোগটি নিয়েছি সেটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্যোগ, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় মিলে যে একটি ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তি কমানো সম্ভব সেটি হয়তো এবারে প্রমাণ করা যাবে। অবশ্যি এটি নূতন করে প্রমাণ করার কিছু নেই, মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষায় বহুদিন থেকে এটি করা হচ্ছে। শুধু যে মেডিক্যাল কলেজের জন্যে এটি করা হয় তা নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতি বছর সারা দেশের অসংখ্য কলেজে তিন-চার লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা নেয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা একবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন আমি সরাসরি নিজের চোখে এই বিশাল দক্ষযজ্ঞ দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। দীর্ঘদিন থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষতার সাথে এই পরীক্ষাটি চালিয়ে আসছে, যার অর্থ বাংলাদেশের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে একটি ভর্তি পরীক্ষা নিতে হলে যে কাজগুলো করতে হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নীরবে প্রতি বছর এই কাজগুলো করে আসছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যম কখনোই এই বিশাল প্রক্রিয়াটি দেশের মানুষের নজরে আসে নি। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যম খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতিবাচক খবরগুলো বের করে সেটা ফলাও করে প্রচার করতে পছন্দ করে, তাদের সত্যিকারের ইতিবাচক সংবাদটি কাউকে জানাতে আগ্রহী হয় না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, দেশের হাইফাই ইউনিভার্সিটির হাইফাই গ্র্যাজুয়েটদের প্রায় সবাই কিন্তু দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে, দেশটি চালাচ্ছে কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটেরা। অথচ সংবাদমাধ্যমের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্যে কোনো সমবেদনা নেই, কোনো মমতা নেই। আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশালসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে, দেশের সরকার যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটু গুরুত্ব দিয়ে তাদের সমস্যাগুলো মিটিয়ে দিতে আগ্রহী হতো তাহলে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর নয়, আমার নিজের দেশের অনেক বড় উপকার হতো।

৩.

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়া মানেই সব সমস্যার সমাধান নয়। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অল্প কিছু আসন, পরীক্ষার্থী অসংখ্য, তাই বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই আসলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না। জিপিএ ফাইভ বা গোল্ডেন ফাইভ পাওয়া অনেক ছাত্রছাত্রী যখন আবিষ্কার করে ভর্তি পরীক্ষার মেধাতালিকায় তাদের নাম নেই তখন তারা একটা অনেক বড় ধাক্কা খায়। যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারা এত দিন লেখাপড়া করে এসেছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে এসেছে, হঠাৎ করে তাদের আত্মবিশ্বাস

ধূলিসাৎ হয়ে যায়, স্বপ্ন খান খান হয়ে যায়। আমি এই ছাত্রছাত্রীদের বলতে চাই, সব সময়েই কিন্তু এর জন্যে তারা নিজেরা দায়ী নয়। এই দেশের অনেক নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নই কিন্তু খুব নিম্নমানের, অনেক সময়েই মেধা তালিকায় ভালো করা আর লটারিতে নাম ওঠার মাঝে বড় কোনো পার্থক্য নেই। হাইকোর্ট থেকে একবার আমাকে খুব বড় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে মতামত দেওয়ার জন্যে ডেকেছিল। আমার তখন সেই ইউনিটের প্রশ্নগুলো দেখার সুযোগ হয়েছিল, আইনজীবীরা কোন প্রশ্নটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে সেটা খুঁজে খুঁজে বের করে দাখিল করেছিলেন এবং আমি একধরনের আতঙ্ক নিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, সেই ভর্তি পরীক্ষার প্রতিটি প্রশ্নই কোনো না কোনো গাইড বই থেকে নেওয়া।

কাজেই ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকায় ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের নাম খুঁজে না পেলে তারা যেন মন খারাপ না করে, নিজের ওপর বিশ্বাস যেন না হারায়। সবসময়েই সেটি মেধার অভাব নয়, অনেক সময় সেটি সঠিক গাইড বই মুখস্থ করার ইচ্ছের অভাবও হতে পারে। এই দেশে যে ভর্তি কোচিংয়ের বিশাল একটা রমরমা ব্যবসা হতে থাকে তার একমাত্র কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মুখস্থনির্ভর গাইড বইয়ের প্রশ্ন!

৪

আমি মনে করি, এখন আমাদের সময় হয়েছে অন্তত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকারের সম্মিলিত একটি ভর্তি পরীক্ষা উপহার দেওয়ার। নিঃসন্দেহে তার আগে অনেক বাধা পার হয়ে আসতে হবে। কিছু কিছু বাধা হয়তো বেশ জটিল, মনে হতে পারে প্রায় দুঃসাধ্য।

কিন্তু এই দেশের নূতন প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমরা যদি সিদ্ধান্তটি নিয়ে নেই তাহলে এই দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক মিলে নিশ্চয়ই সব বাধা অতিক্রম করতে পারব। কিন্তু সিদ্ধান্তটি নিতে হবে প্রথম।

যদি সেই সিদ্ধান্তটি নিতে না পারি তাহলে নূতন প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। আর সংবাদমাধ্যম যদি ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আমাদের ব্যাংক-ব্যালেন্স কতটুকু বেড়ে যায় সেই তথ্যটি প্রকাশ করে দেয় তাহলে আমরা দেশের মানুষের সামনে লজ্জায় মুখও দেখাতে পারব না।

আমাদেরকেই ঠিক করতে হবে আমরা কী চাই।

[অক্টোবর ১১, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

সরকারের কাছে অনুরোধ

আমার এই লেখাটির শিরোনাম দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে আমি বুঝি সরকারের কাছে নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই ধরনের কোনো গুরুতর বিষয় নিয়ে অনুরোধ করতে যাচ্ছি। যারা এ রকম ভাবছেন তাদের কাছে প্রথমেই আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি—আমি মোটেও দেশ কিংবা রাজনীতির কোনো গুরুতর বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি না। গুরুতর বিষয় নিয়ে দেশের সবাই কথা বলছেন, পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে, টেলিভিশনে টক শো হচ্ছে, খবরের কাগজগুলো নিজেদের দায়িত্বে জরিপ করতে শুরু করেছে। শুধু দেশের মানুষ নয়, মনে হয় বিদেশিদেরও রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তারাও অনবরত হুমকি-ধমকি-উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, চীন থেকে আমেরিকা কেউ বাকি নেই। এত জ্ঞানী-গুণী গুরুত্বপূর্ণ মানুষের এত পরামর্শ, এত উপদেশ এর মাঝে আমাদের মতো মানুষের বলার জন্যে বাকি কী আছে—আমি আর নূতন করে কী বলতে পারি! রাজনীতি নিয়ে সারা জীবন যে কথাটি বলে এসেছি সেটি ছাড়া বলার কিছু নেই, এই দেশে জামায়াতে ইসলামী রাজনীতি করতে পারবে না, অন্যরা যেভাবে খুশি রাজনীতি করুক আমার কোনো আপত্তি নেই।

তবে সরকারের কাছে আমি এ ধরনের কোনো বিষয় নিয়ে অনুরোধ করতে যাচ্ছি না, আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয় অনুরোধ করতে যাচ্ছি। অনুরোধটা করার আগে একটু ভূমিকা করতে হবে, ভূমিকাটা এ রকম :

কিছুদিন আগে বের করা হয়েছে যে পৃথিবীর সবগুলো শহরের মাঝে সবচেয়ে বাসের অযোগ্য শহর হচ্ছে দামেস্কাস। কোনো ধরনের জরিপ, বিশ্লেষণ বা গবেষণা না করেই এটা বলে দেওয়া যেত। সেই শহরে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা। সেই দেশের সরকারি বাহিনী কিংবা তার প্রতিপক্ষ কোনো দলই নৃশংসতায় কেউ কারো চাইতে কম নয়। শুধু তা-ই নয়, যে কোনো মুহূর্তে বাইরের

মাতবর দেশগুলো এই দেশটিকে আক্রমণ করে ফেলতে পারে। এইরকম যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশের ক্ষতবিক্ষত একটা শহর তো সারা পৃথিবীর সবচাইতে বাসের আযোগ্য শহর হতেই পারে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এবং আমার বক্তব্য সেটি নয়।

আমার বক্তব্য বাসের অযোগ্য দ্বিতীয় শহরটি নিয়ে। এত দিনে পৃথিবীর সবাই জেনে গেছে সেই শহরটি হচ্ছে ঢাকা শহর। দামেস্কাস শহরকে যদি জরিপে আনা না হতো তাহলে ঢাকা শহর হতো সারা পৃথিবীর মাঝে সবচাইতে বাসের অযোগ্য শহর। যারা এই শহরে থাকে তারা নিশ্চিতভাবে গর্ব করে বলতে পারে তারা কার্যত পৃথিবীর সবচেয়ে বাসের অযোগ্য শহরটি কেমন হতে পারে সেটি নিজের চোখে দেখেছে, সেই শহরে বসবাস করেছে!

পশ্চিমা জগৎ পৃথিবীর মোড়ল হিসেবে নানা দেশের জন্যে যে সার্টিফিকেটগুলো দেয় সেগুলো যে সব খাঁটি এবং বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট আমি সেটা কখনো বলি না। সারা পৃথিবী থেকে মানুষরা পাগলের মতো আমেরিকা ছুটে যায় কিন্তু আমেরিকা সেই দেশের কালো মানুষদের যেভাবে রেখেছে তার পরিসংখ্যান দেখলে যে কোনো মানুষ হতবাক হয়ে যাবে। সেই দেশের মানুষ যেভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারে কিংবা ব্যবহার করতে পারে সেটি পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে হওয়া সম্ভব সেটিও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার হিসেবে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে অমানবিক দেশগুলোর একটি—কিন্তু আমার কথা কে বিশ্বাস করবে? আমি তো ভালো আর মন্দ দেশের সার্টিফিকেট দেই না।

তবে কেউ অস্বীকার করবে না সারা পৃথিবীর (প্রায়) সবচেয়ে বাসের অযোগ্য শহর হিসেবে ঢাকা শহরের এই সার্টিফিকেট পাওয়ার পেছনে যুক্তির কোনো অভাব নেই। এই শহরে প্রায় দেড় কোটি মানুষ থাকে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে দেড় কোটি দূরে থাকুক চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ লোকও নেই। (মনে আছে একবার ডেনমার্কে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমার দেশের লোকসংখ্যা কত? সে বলল, পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি। শুনে আমি হা হা করে হেসে বললাম, তোমার দেশের সব মানুষকে আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিলে আমরা তাদের মিরপুরে আঁটিয়ে দিতে পারব।) একটা শহরে যদি দেড় কোটি মানুষ থাকে তাহলে সেই শহরের উপর কী ভয়ংকর চাপ পড়তে পারে সেটা কল্পনাও করা সম্ভব নয়। দেড় কোটি মানুষ একসাথে হাঁচি দিলেই মনে হয় একটা ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাবে। সব সময় সব জায়গায় অনেক মানুষ থাকলে অপরাধীরা অপরাধ করতে একটু ভয় পায়, তারপরেও ঢাকা শহরে সন্ত্রাসের কোনো ঘাটতি নেই। ঢাকা শহরের যেসব মধ্যবিত্ত মানুষকে রাত-বিরেতে চলাফেরা করতে হয় তাদের মাঝে মনে হয় একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ছিনতাই হয়নি কিংবা মলম পার্টির খপ্পরে পড়েনি। ছিনতাই-চুরি-ডাকাতি ছাড়াও রাজনৈতিক সন্ত্রাসেরও কোনো ঘাটতি নেই। পথেঘাটে বোমাবাজি-ককটেল মনে হয় এখন ঢাকাবাসীর নিত্যসঙ্গী। (হেফাজতে ইসলাম মে মাসের পাঁচ তারিখ ঢাকা শহরে যে কাণ্ড করেছিল সে রকম ঘটনা সারা পৃথিবীতেও কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।) দৈনন্দিন জীবনেও মনে হয় আমাদের অনেক দুঃখের ইতিহাস আছে। যে শহরে দেড় কোটি মানুষ থাকে

সেই শহরে স্কুলের বাচ্চা নিশ্চয়ই দশ-বিশ লক্ষ। তাদের স্কুলগুলো দেখলে চোখে পানি চলে আসবে, চার দেওয়ালে ঘেরা শুধু একটা বিল্ডিং, বাচ্চাদের দৌড়াদৌড়ি করার কোনো খেলার মাঠ নেই। তাদের একমাত্র খেলাধুলা হয় কম্পিউটারের স্ক্রিনে। সারা শহরে শুধু কংক্রিটের দালান। সিলেট থেকে আমাকে যখন প্লেনে ঢাকা আসতে হয়, তখন ঢাকা শহরের কাছাকাছি এসে নিচের দিকে তাকিয়ে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একটা বিল্ডিংয়ের পাশে আরেকটা বিল্ডিং, কোথাও এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই, একটা গাছ নেই, একটা মাঠ নেই, একটা পুকুর নেই। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখলে আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না কেন ঢাকা শহরকে পৃথিবীর (প্রায়) সবচেয়ে বাসের অযোগ্য হিসেবে ঘোষণা দেওয়াটি এমন কিছু বড় অন্যায় হয়নি।

ঢাকা শহরের সমস্যা বলা শুরু করলে চট করে থেমে যাওয়ার সুযোগ নেই, কিন্তু ঢাকা শহরের সব মানুষকে যেটি কোনো না কোনোভাবে কষ্ট দিয়েছে সেটি হচ্ছে যানজট। (মাত্র কিছুদিন আগে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গাড়ি থেকে নেমে টানা চার ঘণ্টা হেঁটে যানজট থেকে বের হয়ে এসেছি।) আমি সিলেটে ক্যাম্পাসে থাকি আর মাত্র পাঁচ মিনিটে হেঁটে হেঁটে আমি ক্লাস নিতে হাজির হই। চারপাশে সবুজ গাছ, ধানক্ষেত, বাতাসে বিশুদ্ধ অক্সিজেন। কিন্তু আমাকে মাঝে মাঝে ঢাকা যেতে হয়, গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে হাজির হতে গিয়ে আমি আবিষ্কার করেছি, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যেতে কত সময় লাগতে পারে। আজকাল তার অনুমান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো জায়গায় যেতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যায়। সময়ের অপচয়ে নিশ্চয়ই আর্থিক ক্ষতি হয়। ঢাকা শহরের সব মানুষের প্রতিদিন যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, কেউ যদি সেটা হিসেব করে তাহলে নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমার ধারণা সেই টাকা বাঁচানো গেলে প্রতি মাসে একটা করে পদ্মা সেতু বানানো যেত।

আজকাল আমার ঢাকা শহরে যেতে ভয় করে। ঢাকা শহরে পৌঁছে আমি আমার মায়ের সাথে দেখা করতে যাই গভীর রাতে—যখন পথেঘাটে ভিড় কমে যায়। যানজট সমস্যার এটা কোনো সমাধান হতে পারে না। কিন্তু আমার ধারণা খুব সহজেই অন্য এক ধরনের সমাধান দেওয়া যায়, সবার জন্যে না হলেও অনেকের জন্যে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের জন্যে।

২.

কয়েক বছর আগে আমি যখন ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন গিয়েছি তখন বিষয়টি প্রথমে আমার চোখে পড়েছে। সেই শহরে সবাই যেন সাইকেলে শহরে যাতায়াত করতে পারে তার জন্যে ব্যবস্থা করা আছে। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই সাইকেলে যাচ্ছে-আসছে আর সাইক্লিস্টরা যেন নিরাপদে যেতে পারে সে জন্যে সব গাড়ি, বাস, ট্রাক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে। হঠাৎ করে দেখলে কারো ধারণা হতে পারে যে শহরের কিছু মানুষ বুঝি মজা করার জন্যে সাইকেলে বের হয়েছে। একটু

পরে সবাই বাড়ি পৌঁছে তাদের গাড়ি নিয়ে বের হবে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। সেই দেশের অনেক মানুষের গাড়ি কেনার এবং গাড়ি চড়ার সামর্থ্য থাকার পরও তারা গাড়ি কেনে না, গাড়ি চালায় না, তারা সাইকেলে যাতায়াত করে। ডেনমার্কে যাওয়ার পর আমি সেটা আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের কনভেনশনের সেক্রেটারি মেয়েটির কাছ থেকে। কম বয়সী হালকা ছিপছিপে মেয়ে কিন্তু সে নিজেই কথা প্রসঙ্গে আমাদের জানাল সে সন্তানসম্ভবা। আমি এর মাঝে জেনে গিয়েছি সে সাইকেলে করে সব জায়গায় যাতায়াত করে। আমি তাকে বললাম, তার একটা শিশু সন্তান জন্ম নেওয়ার পর সে নিশ্চয়ই তার শিশুটিকে নিয়ে সাইকেলে যাতায়াত করতে পারবে না। কিন্তু মেয়েটি মাথা নেড়ে প্রবল বেগে আপত্তি করে আমাকে জানাল, তার শিশু সন্তান জন্ম নেওয়ার পরও সে সাইকেলে যাতায়াত করবে, বাচ্চাটাকে নেওয়ার জন্যে সাইকেলের সাথে একটা ক্যারিয়ার লাগিয়ে নেবে। শুধু তা-ই নয়, বাচ্চা জন্মানোর পর তাকে বাসায় নিয়ে আসবে সাইকেলে!

আমি ডেনমার্ক বিশেষজ্ঞ নই তাই এই মেয়েটিই সেই দেশের স্বাভাবিক চিত্র নাকি ব্যতিক্রম আমি সেটা জানি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে একজন মেয়ে তার শিশু সন্তানের জন্ম, বাসায় শিশুটিকে নিয়ে আসা, শহরে ঘোরাঘুরি সব কিছু পরিকল্পনা করতে পারে সাইকেল দিয়ে, সেই শহরটি শহরবাসীর জন্যে সে রকম ব্যবস্থা করে রেখেছে। সেই দেশের মানুষের গাড়ি কেনার ক্ষমতা থাকার পরও গাড়ি কেনে না! সাইকেল দিয়ে সেই শহরের মানুষ সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারে।

তাহলে আমাদের ঢাকা শহরে কেন সেটা হতে পারে না? আমি এখানে অনেক ছাত্রকে জানি যারা এখনই ঢাকা শহরে সাইকেলে যাতায়াত করার চেষ্টা করে। যেহেতু শহরটিকে সাইকেলে চলাচল করার উপযোগী করে রাখা হয়নি তাই তাদের অনেকেই নানা রকম একসিডেন্ট করে অল্পবিস্তর কষ্ট করেছে। যদি ঢাকা শহরে গাড়ি-বাস-ট্রাক-টেম্পুর পাশাপাশি মূল রাস্তাগুলো দিয়ে সমানভাবে সাইকেলেও যেতে পারত, আমার ধারণা তাহলে যানজটের বিরাট একটা অংশ রাতারাতি নিয়ন্ত্রণের মাঝে নিয়ে আসা যেত। এ জন্যে হাজার কোটি টাকা খরচ করে ফ্লাইওভার তৈরি করতে হবে না, শুধুমাত্র রাস্তার পাশে কংক্রিটের ডিভাইডার ফেলে সাইকেল যাওয়ার জন্যে সরু একটা রাস্তা করে দিতে হবে। নিয়ম করে দিতে হবে রাস্তার সেই অংশ দিয়ে শুধুমাত্র সাইকেল যাবে—অন্য কিছু নয়। আমার ধারণা তরুণ প্রজন্ম এটি লুফে নেবে। যানজটে ঘণ্টার ঘর ঘণ্টা বসে না থেকে তারা সাইকেল চালিয়ে চোখের পলকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাবে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখন আমি সাইকেলে করে আসতাম। ঢাকার রাস্তায় তখন গাড়ি-বাস-ট্রাক অনেক কম ছিল, আমি তাদের ফাঁক দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কলেজগেট থেকে নিয়মিতভাবে কার্জন হলে যাওয়া-আসা করতাম। চল্লিশ বছর আগে আমি বড় বড়

রাস্তায় যেটা করতে পেরেছি, এখন সেটি আর সম্ভব নয়। কিন্তু সাইকেলের জন্যে আলাদা লেন করে দিলে অবশ্যিই সেটা সম্ভব।

কাজেই আমি সরকারের কাছে এই অনুরোধটা করতে চাই, ঢাকা শহরের সব বড় রাস্তার দুই পাশে সাইকেলের আলাদা লেন করে দেওয়া হোক। পৃথিবীর অন্য সব দেশে যেভাবে সাইকেলে করে মানুষ যাতায়াত করে রাস্তাঘাটের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে এনেছে, আমাদের ঢাকা শহরেও সেটা করা হোক। এর জন্যে সরকারের সত্যিকার অর্থে কোনো বাজেট লাগবে না—কিন্তু যদি করে দেয়া হয় তাহলে মানুষের যে সময় বাঁচবে, তার আর্থিক মূল্য নিশ্চয়ই মোটেও হেলাফেলার বিষয় নয়।

আমি মনে মনে কল্পনা করতে পারি ঢাকা শহরের রাস্তার পাশে সাইকেলের আলাদা লেন, সেটি নিরাপদ, সেখানে হুট করে কোনো বাস, গাড়ি, ট্রাক, টেম্পু চলে এসে কাউকে আঘাত করতে পারবে না, তাই ঢাকা শহরের সব কম বয়সী তরুণ-তরুণী, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সাইকেল চালিয়ে তাদের গন্তব্যে, তাদের স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে? সাইকেল চালাতে শরীরের মাংসপেশি ব্যবহার করতে হয়। কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা তরুণ প্রজন্ম প্রথমবার পথে নেমে আসতে পারবে, দেখতে দেখতে তাদের শরীর শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠবে, তাদের জীবনীশক্তি শতগুণে বেড়ে যাবে।

যদি সত্যি সত্যি এধরনের একটা পরিকল্পনা নিতে হয় আমি নিশ্চিত তাহলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে। তারা ঢাকা শহরের পথঘাট ঘাঁটাঘাঁটি করে, গুগল ম্যাপ দেখে অঙ্ক কষে হিসেব করে বের করে ফেলতে পারবে কোন কোন রাস্তার কতটুকু অংশে কত বড় লেন তৈরি করা হলে সেটি হবে সবচেয়ে কার্যকর!

যদি সত্যি সত্যি ঢাকা শহরের যানজট সাইকেল ব্যবহার করে কমিয়ে আনা যায় তাহলে সামনের বছর যখন বাস করার অনুপযোগী শহরের তালিকা করা হবে তখন ঢাকা শহরের স্থান নিশ্চয়ই সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকবে না—বেশ খানিকটা ভালো অবস্থায় চলে আসবে।

সামনে নির্বাচন। গত নির্বাচনের ফলাফল ঠিক করেছিল তরুণরা। এই নির্বাচনেও কি সেই তরুণদের কিছু একটা উপহার দেয়া যায় না? আমার ধারণা যানজটের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সাইকেলের জন্যে আলাদা একটি লেন চমৎকার একটা উপহার হতে পারে। এর জন্যে টাকা-পয়সার দরকার নেই, দরকার শুধু একটা সিদ্ধান্তের।

প্রায় চল্লিশ বছর হলো আমি সাইকেল চালাই না। প্রিয় শহর ঢাকার পথে পথে সাইকেল চালানো না জানি কত আনন্দের—আমি অপেক্ষা করে আছি কবে আবার সেই সুযোগ পাব।

পাব কি?

[অক্টোবর ২৫, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

ভাবনা এবং দুর্ভাবনা

১.

এই সপ্তাহে বদর বাহিনীর নেতা চৌধুরী মুইন উদ্দিন আর আশরাফুজ্জামানের বিচারের রায় হয়েছে। একাত্তরের ডিসেম্বর মাসে যখন সবাই বুঝে গেল পাকিস্তান মিলিটারির পরাজয় সুনিশ্চিত তখন জামায়াতে ইসলামীর কিলিং স্কোয়াড কুখ্যাত বদর বাহিনী সিদ্ধান্ত নিল দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই যতজন সম্ভব শিক্ষক, ডাক্তার, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ার—এককথায় সব ধরনের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলতে হবে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী চৌধুরী মুইন উদ্দিন আর আশরাফুজ্জামান মাইক্রোবাসে করে ঘুরে ঘুরে এই দেশের সোনার সন্তানদের তুলে নিয়ে হত্যা করেছে। এরা দুজনই তখন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনের নেতা।

৪২ বছর আগের কথা হলেও আমার এখনো সব স্পষ্ট মনে আছে, মনে হয় বুঝি মাত্র সেদিনের কথা। পাকিস্তান মিলিটারি আত্মসমর্পণ করার পর, দেশ সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হওয়ার পর আমরা তখন প্রথমবার স্বাধীন দেশের রাজপথে বের হয়েছি। সেই অবিশ্বাস্য আনন্দের কথা আমাদের প্রজন্ম কোনো দিন ভুলতে পারবে না। প্রথম যেদিন খবরের কাগজ বের হয়েছে সেখানে দেখি এই দুই নরঘাতক, চৌধুরী মুইন উদ্দিন আর আশরাফুজ্জামানের ছবি। তখন ধীরে ধীরে বুদ্ধিজীবী হত্যার খবর বের হয়ে আসতে শুরু করেছে, খবরের কাগজে এই দুই নরঘাতককে ধরিয়ে দেওয়ার আবেদন বের হয়েছে। পৃথিবীর সব কাপুরুষ নরঘাতকদের মতো তারাও আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচিয়েছে। তাদেরকে ধরা যায়নি—শুধু তা-ই নয়, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে যখন এই দেশে মিলিটারি শাসন শুরু হলো তখন পুরো দেশটা "এবাউট টার্ন" করে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। এই দুই নরঘাতক তখন দেশ থেকে ঘুরে গেছে, কেউ তাদের স্পর্শ করেনি।

শেষ পর্যন্ত এ দেশের মাটিতে তাদের বিচার হয়েছে। তাদের দুজনকেই ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ইংল্যান্ড-আমেরিকা থেকে ধরে এনে এ দেশের মাটিতে ফাঁসি দেওয়া যাবে কি না আমরা জানি না। শুধু এটুকু জানি ইতিহাসের পাতায় তারা দেশদ্রোহী নরঘাতক হিসেবে পাকাপাকিভাবে চিহ্নিত হয়ে গেল। আজ থেকে শত বছর পর আমরা কেউ থাকব না কিন্তু এই ইতিহাসের পাতাটি থেকে যাবে, যেখানে ভবিষ্যতের বংশধরেরা ঘৃণা ভরে এই মানুষ দুটির দিকে তাকাবে।

১৯৭১ সালে চৌধুরী মুইন উদ্দিন আর আশরাফুজ্জামনের মতো জামায়াতে ইসলামীর অনেক নেতা-কর্মী ছিল যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আজ্ঞাবহ হয়ে এই দেশের গণহত্যাকে সাহায্য করেছে। একাত্তরে এই রাজনৈতিক দলটির যে চরিত্র ছিল ২০১৩ সালে কি সেই চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়েছে? আমার মনে হয় না, যদি হতো তাহলে তারা যুদ্ধাপরাধীর বিচার মেনে নিয়ে, তারা নিজের দলকে গ্লানিমুক্ত করত। আমরা সবাই দেখেছি একেকজন করে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় বের হয়েছে আর এই দলটি তার প্রতিবাদে সারা দেশে একধরনের তাণ্ডব শুরু করেছে। তারা কি বিশ্বাস করে একাত্তরে তারা যা করেছিল সেটা সঠিক? তারা কি মনে করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আজ্ঞাবহ হয়ে দেশে গণহত্যা করা যায় এবং যারা সেটি করেছে এই দেশের মানুষ তাদের বিচার করতে পারবে না? তারা কি বিশ্বাস করে চৌধুরী মুইন উদ্দিন আর আশরাফুজ্জামানের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার অধিকার ছিল? একাত্তরে তাদের কাছে সেটি যদি কোনো অপরাধ না হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতেও কী সেটি আবার করা যাবে?

আমি এই প্রশ্নটি করছি কারণ একাত্তরে এই রাজনৈতিক দলটি যা যা করেছিল এখন তারা আবার ঠিক সেই একই কাজগুলো করতে শুরু করেছে। তারা হিন্দুদের আক্রমণ করছে, তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। ট্রেন লাইন তুলে ফেলছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরদের খুন করেছে।

সামনে নির্বাচন। নির্বাচন কীভাবে হবে সেটা এখনো দেশের কেউ জানে না। দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানী-গুণী মানুষরা এই নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, কাজেই নিশ্চয়ই কিছু একটা ফর্মুলা বের হয়ে যাবে, আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার প্রশ্ন নির্বাচনের পরের অংশটুকু নিয়ে। জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে বিএনপি গতবার নির্বাচনে জিতে আসার পর এই দেশের হিন্দুদের ওপর যে বিভীষিকা নেমে এসেছিল আমি এখনো সেটা ভুলতে পারি না। (আমার সেটি নিয়ে একটা অন্য রকম ক্ষোভ আছে, এই দেশে প্রগতিশীল হিসেবে যেসব পত্রিকা অহংকার করে কিংবা যেসব বুদ্ধিজীবী নিজেদের প্রগতিশীল হিসেবে পরিচয় দেন তারা দীর্ঘদিন তাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। শাহরিয়ার কবীরদের মতো কিছু মানুষ বিষয়টিকে সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর পর খুব অনিচ্ছাসত্ত্বে এইসব পত্রিকা তাদের রিপোর্টগুলো প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। যারা আমার কথা বিশ্বাস করেন না, তারা আজ থেকে ঠিক এক যুগ আগের পত্রপত্রিকা বের করে পড়ে দেখতে পারেন) এই নির্বাচনে বিএনপি যদি

জিতে আসে তাহলে কি এবারেও সেই বিভীষিকাটি আমাদের দেখতে হবে? এবার যেহেতু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে তাই যারা যুদ্ধপরাধীদের বিচার চেয়েছে তাদের ওপর নূতন মুইন উদ্দিন আর নূতন আশরাফুজ্জামানরা আক্রমণ করবে? এক যুগ আগে যে রকম সরকার চোখ বন্ধ করেছিল, আবার কি সে রকম হবে?

আমার দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন আছে, কার কাছে সেই প্রশ্ন করব বুঝতে পারছি না। আমরা সবাই দেখেছি ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে হেফাজতে ইসলাম নামে একটা সংগঠন হঠাৎ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। পত্রপত্রিকায় যেসব খবরাখবর পড়েছি তাতে মনে হয়েছে, এটি বুঝি আওয়ামী লীগেরই তৈরি করা একটি ইসলামী দল, কারণ দেখতাম আওয়ামী লীগের মন্ত্রী হেফাজতে ইসলামের হুজুরদের সামনে নত শিরে বসে থাকতেন! হঠাৎ করে দেখা গেল হেফাজতে ইসলাম আসলে জামায়াতে ইসলামেরই একটা নূতন সংস্করণ। গণজাগরণ মঞ্চের ওপর তাদের বিশেষ রাগ, আমি একদিন শাহবাগে বসেছিলাম যখন হেফাজতের কর্মীরা তাদের সম্মেলনের পর শাহবাগ আক্রমণ করেছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেই আক্রমণ ঠেকিয়েছিল, তা না হলে কী হতো আমি এখনো জানি না।

যাই হোক, হেফাজতে ইসলামের তেরো দফা দাবি রয়েছে, সেই তেরো দফা দাবি মানা হলে বাংলাদেশ এক ঘণ্টার মাঝে আফগানিস্তান হয়ে যাবে! সেই দাবিগুলো মেয়েদের জন্যে শুধু অপমানজনক নয়, ভয়ংকর রকম বিপজ্জনক। মেয়েদের এ রকম অসম্মান করা দাবি-দাওয়া কেমন করে দেওয়া হলো, সেটা নিয়ে আমার একধরনের বিস্ময় ছিল ঠিক তখন হেফাজতের নেতা আহমেদ শফীর সেই বিখ্যাত তেঁতুলসংক্রান্ত বাণীটি প্রচারিত হলো। আমাদের দেশ যে হাজার রকম বাধা-বিপত্তির মাঝেও সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে, এই দেশে ছেলেরা আর মেয়েরা পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে। একাত্তরে এই দেশে অসংখ্য পরিবারের পুরুষ সদস্য মারা যাওয়ার পর মেয়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের রক্ষা করার জন্যে ঘরের বাইরে এসে কাজ শুরু করেছিল—সেখান থেকে শুরু। এখন আমাদের দেশে ছেলেরা যে কাজ করতে পারে মেয়েরাও সেই কাজ করতে পারে। মেয়ে শ্রমিক এই দেশে খুব পরিচিত একটা দৃশ্য। স্কুলে অনেক জায়গায় ছেলেদের থেকে মেয়েরা বেশি! হেফাজতে ইসলামের নেতা আহমেদ শফী তার তেঁতুল তত্ত্বে পরিষ্কার বলে দিলেন মেয়েদের ক্লাস ফোর-ফাইভ থেকে বেশি পড়ার প্রয়োজন নেই! পুরুষদের একাধিক বিয়ে করতে উৎসাহ দিলেন। পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে ঘোর অবৈজ্ঞানিক কিছু তত্ত্ব দিয়ে সেটা নিরুৎসাহিত করলেন! যে সংগঠনের নেতার এ ধরনের বিশ্বাস তারা এই দেশে মেয়েদের সম্মান করবে সেটা তো আশা করা যায় না।

মেয়েদের অসম্মান করা ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার আছে। মে মাসের ৫ তারিখ একজন হেফাজতে ইসলামের কর্মী তার হুজুরের আদর্শে বলীয়ান হয়ে একটি এসএমএস পাঠিয়ে পরিষ্কারভাবে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে সম্ভবত এটাই আমার শেষ রাত, পরদিন আমাকে জবাই করা হবে। কিছুদিন আগে হেফাজতে ইসলামের

নেতাদের চালানো মাদ্রাসায় বোমা তৈরি করার সময় বেশ কয়েকজন মাদ্রাসা ছাত্র মারা গেছে। যার অর্থ তাদের কাজকর্ম শুধু আইন করে মেয়েদের ঘরের মাঝে বন্দি করে ফেলার মাঝে সীমিত নয়; বোমা তৈরি, বোমা ব্যবহার কিংবা আমাদের মতো মানুষদের জবাই করা ধরনের কাজেও তাদের উৎসাহ রয়েছে।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলে সমস্যা ছিল না, আমার সমস্যা অন্য জায়গায়। বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে তারা ক্ষমতায় গেলে হেফাজতে ইসলামের এই তেরো দফা বাস্তবায়ন করবে। প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার জরিপ করে বের করেছে নির্বাচনে বিএনপি এগিয়ে। তাহলে কি আমরা ধরে নেব নির্বাচনের পর বিএনপি ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে বাংলাদেশের মেয়েরা ঘরের মাঝে বন্দি হয়ে যাবে? আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা পাশাপাশি লেখাপড়া করে, তারা আর পাশাপাশি পড়াশোনা করতে পারবে না? হেফাজতে ইসলামের তেরো দফা মেনে তো আর যাই হোক আধুনিক বাংলাদেশ কল্পনা করা যাবে না।

আজকাল দেশের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলো জরিপ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বের করে নিয়ে আসছে। মজার ব্যাপার হলো, ষোলো কোটি মানুষের দেশে হাজার দেড়েক মানুষের জরিপ নিলেই ষোলো কোটি মানুষের মনের কথা বের হয়ে আসছে! তাহলে নির্বাচনের আগে আগে আমরা কিছু জরুরি জরিপ কেন করে ফেলি না? এই দেশের ভোটারদের অর্ধেক হচ্ছে মহিলা—আমরা কেন শুধু মহিলাদের মাঝে একটা জরিপ নিয়ে জেনে নিই না আগামী নির্বাচন নিয়ে তারা কী ভাবছে? বাংলাদেশটা যখন একটা আধুনিক দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে ঠিক তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল হেফাজতে ইসলামের তেরো দফা বাস্তবায়ন করার কথা বলে নির্বাচন করবে! এই দেশের মেয়েরা কী সেটা মেনে নেবে? স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা মেনে নেবে? গার্মেন্টসের মেয়েরা মেনে নেবে? মেয়ে নির্মাণশ্রমিকরা মেনে নেবে? মায়েরা মেনে নিবে?

২.

আমি যখন এই লেখাটি লিখছি তখন সারা দেশে হরতাল চলছে। নূতন প্রজন্ম আসলে কখনো সত্যিকারের হরতাল দেখেনি। একাত্তরে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধুর ডাকে এ দেশে কিছু হরতাল হয়েছিল, যারা সেগুলোতে অংশ নিয়েছে শুধু তারাই বলতে পারবে হরতাল ব্যাপারটা কী!

এখন যে হরতাল দেওয়া হয় সেগুলো মানুষকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা ঘরের মাঝে বসে নিজের কাজ করি (সত্যি কথা বলতে কী, এই হরতালের কারণে আমার একটা আস্ত বই লেখা হয়ে গেছে!) কিন্তু গরিব মানুষের খুব কষ্ট। তারা নিশ্চয়ই একধরনের বিস্ময় নিয়ে ভাবে কেমন করে এই দেশের মানুষ এত মমতাহীন হতে পারে। কেমন করে তারা নিজেরা বাড়তি একটা দিন ছুটি উপভোগ করে তাদের মতো গরিব মানুষদের অভুক্ত থাকার দিকে ঠেলে দেয়। সত্যি কথা বলতে কী, এই

দেশের দুঃখী মানুষ সেটাও সহ্য করতে রাজি ছিল, কিন্তু ইদানীং যে ব্যাপারটা ঘটছে সেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

আমরা সবাই দেখেছি হরতালের পিকেটিং করার জন্যে গাড়ির ভেতরে মানুষ রেখে গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত শরীর পুড়ে একজন কিশোর অঙ্গার হয়ে বসে আছে। এর চাইতে ভয়ংকর হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর দৃশ্য আর কি হতে পারে? কাজকর্ম করতে গিয়ে চুলোর কাছে কিংবা মোমবাতির আলোতে যখন হঠাৎ করে আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগে তখন আমরা সেই যন্ত্রণায় ছটফট করি। যখন একজন মানুষের পুরো শরীর আগুনে পুড়ে যায় তখন সেই যন্ত্রণা না জানি কত ভয়ানক! কত নিষ্ঠুর হলে একজন মানুষ সম্পূর্ণ বিনা কারণে আরেকজন মানুষকে পুড়িয়ে মারতে পারে? তাদের মনের ভেতর কি সেটা নিয়ে এতটুকু অপরাধবোধ নেই? ধরে নিতে হবে এটা রাজনীতির ধারা? হরতালকে সফল করার জন্যে দেশের কিছু মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে? এই দেশের মানুষ হিসেবে আমি কি নিজেকে এই অপরাধবোধ থেকে মুক্ত রাখতে পারব?

এই দেশের মানুষ হিসেবে আমরা অনেক আগেই মেনে নিয়েছি যে এখানে হরতাল হবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হবে না, পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে, গরিব মানুষ অভুক্ত থাকবে, রোগাক্রান্ত মানুষ চিকিৎসা পাবে না কিন্তু হরতালকে সফল করার জন্যে মানুষকে পুড়িয়ে মারা হবে সেটি আমরা কখনো মেনে নেইনি।

মানুষের অভিশাপ বলে কী সত্যিই কিছু আছে? যদি থাকে তাহলে সেই ভয়ংকর অভিশাপ থেকে এই রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা কি নিজেদের রক্ষা করতে পারবে?

পারবে না।

[নভেম্বর ৮, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

প্রতিবন্ধী নই—মানুষ

১.

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অনেক কাজ করি, সে কারণে তাদের অনেকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। একবার কোনো এক কারণে আমি তাদের অফিসে গিয়েছি, সেখানে যারা ছিলেন তাদের প্রায় সবাই শুধু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নন, বেশিরভাগই পুরোপুরি দৃষ্টিহীন। সে জন্যে তারা যে কোনো কাজকর্ম করছেন না তা নয়, সবাই কিছু না কিছু করছেন। কথা বলতে বলতে সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন হঠাৎ কারেন্ট চলে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। কারেন্ট চলে গিয়ে অন্ধকার হলে আমাদের কাজকর্ম থেমে যায়। কারেন্ট এলে আবার কাজ শুরু হয়। আমি নিজের অজান্তেই সে রকম কিছু একটা ভেবেছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম সেই প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজ বন্ধ হলো না। সবাই নিজের মতো কাজ করতে লাগলেন। বিষয়টা আমার আগেই অনুমান করার কথা ছিল কিন্তু কখনো মাথায় আসেনি। আমরা যারা চোখ ব্যবহার করে কাজকর্ম করি তারা অন্ধকারে কাজ করতে পারি না। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা পারে, আলো না থাকলে আমরা খানিকক্ষণের জন্যে প্রতিবন্ধী হয়ে যাই, তারা হয় না।

আমার অবশ্যি তখন আরো কিছু জানা বাকি ছিল। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়ার জন্যে ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। কাগজে যখন ব্রেইলে কিছু লেখা হয় তখন সেটা খানিকটা উঁচু হয়ে যায় এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা হাত দিয়ে স্পর্শ করে সেটা পড়তে পারেন। এই ব্রেইল প্রিন্টার খুব দামি একটা প্রিন্টার, তাই অনেক দিন থেকেই আমি সাধারণ ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার দিয়ে ব্রেইলে লেখার একটা পদ্ধতি বের করার চেষ্টা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেই প্রিন্টার তৈরি হয়েছে এবং সেই প্রিন্টারে লেখা পড়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা খুব খুশি। এ রকম সময়ে তাদের কম বয়সী একজন ছেলে বলল, "স্যার, আমাদের এখানে সত্যিকারের ব্রেইল প্রিন্টার আছে, আপনাকে দেখাই।" আমি আগে

ব্রেইল প্রিন্টার দেখিনি, তার সাথে পাশের ঘরে গেলাম। সেখানে সে কম্পিউটার টেপাটেপি করে ব্রেইল প্রিন্টারে কিছু একটা প্রিন্ট করতে দিল। সারা পৃথিবীর সকল প্রিন্টারে যা হয় এই মহামূল্যবান প্রিন্টারেও তাই হলো—হঠাৎ করে ভেতরে কাগজটা আটকে গেল। আমি ধরেই নিলাম ব্রেইল প্রিন্টার দেখানোটা আজকের মতো এখানেই শেষ।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ব্রেইল প্রিন্টার দেখানো এখানেই শেষ হলো না, কারণ আমি দেখলাম পুরোপুরি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলেটা একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে প্রিন্টারটা খুলতে শুরু করল। কিছুক্ষণেই সে প্রিন্টারটা খুলে ফেলল এবং ভেতরের যন্ত্রপাতি আলাদা হয়ে গেল এবং ভেতরে কোনো এক জায়গায় আটকে থাকা কাগজটা টেনে বের করে ফেলল। তারপর যে দক্ষতায় সে প্রিন্টারটি খুলেছিল সেই একই দক্ষতায় পুরো প্রিন্টারটা জুড়ে ফেলল। (আমি যখন যন্ত্র খুলে সেটা আবার লাগানোর চেষ্টা করি তখন সব সময়েই কিছু স্ক্রু বাড়তি থেকে যায়, এবারে কিন্তু কোনো বাড়তি স্ক্রু থাকল না এবং সব স্ক্রু ঠিক ঠিক জায়গায় লাগানো হয়ে গেল!) প্রিন্টার রেডি হওয়ার পর সে আবার কম্পিউটার টেপাটেপি করে কাগজে ব্রেইল প্রিন্ট করে দেখাল। ব্রেইল প্রিন্টার দেখে আমি যতটুকু মুগ্ধ হয়েছিলাম তার থেকে একশ গুণ বেশি মুগ্ধ হলাম এই ছেলেটিকে দেখে। একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ নিশ্চয়ই কিছু কিছু কাজ কখনোই করতে পারবে না, আমার মনে সে রকম একটা ধারণা ছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম কিছু কিছু কাজ নিশ্চয়ই শুধুমাত্র যারা দেখতে পায় তারা করবে। আমার ভুল ভাঙল, কে কী কাজ করতে পারবে আর কী কাজ করতে পারবে না সেই সীমারেখাটি কেউ কোনো দিন টানতে পারবে না। আমি যাকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভেবে এসেছি আসলে নিজের চোখে দেখলাম দৃষ্টি না থাকাটা এখন আর তার জন্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, আমরা যে কাজটা আমাদের দৃষ্টি ব্যবহার করে করি, এই ছেলেটি সেই একই কাজ দৃষ্টি ব্যবহার না করেই করতে শিখেছে। সবাই হয়তো তার মতো পারবে না কিন্তু এই ছেলেটি যেহেতু পারে তার অর্থ চেষ্টা করলে পারা সম্ভব। ঠিকভাবে সুযোগ দেওয়া হলে আরো অনেকে নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু করতে পারবে যেটা আমরা এখন চিন্তাও করতে পারি না। আমার মনে হলো হয়তো প্রতিবন্ধী শব্দটাই নূতন করে ব্যাখ্যা করা দরকার, তার কারণ একজন একদিকে প্রতিবন্ধী হলেও অন্যদিকে তারা সেটি পূরণ করে নিতে পারে, আমাদের শুধুমাত্র সেই সুযোগটি করে দিতে হবে।

এটি যে আমার দেখা একটি মাত্র ঘটনা তা কিন্তু মোটেও নয়। বেশ কয়েক বছর আগে একটি মেয়ে আমাকে কোনো একটি কাজে ফোন করেছিল। ফোনে কথা বলে বুঝতে পারলাম সে শারীরিকভাবে একজন প্রতিবন্ধী মানুষ, তাকে চলাফেরার জন্যে হুইল চেয়ারের ওপর নির্ভর করতে হয়। আমাকে কেন ফোন করেছিল এত দিন পরে আর মনে নেই, আমি তাকে সম্ভবত ছোটখাটো সাহায্যও করেছিলাম। মেয়েটি ব্লগে লেখালেখি করে, প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকার নিয়ে সে রীতিমতো একটা আন্দোলন

শুরু করেছে। তার তৈরি করা একটা সংগঠনও আছে এবং সেখানে আরো অনেকে যোগ দিয়েছে। (মেয়েটির বা তার প্রতিষ্ঠানের নাম বললে অনেকেই হয়তো তাকে চিনে যাবে, ইচ্ছে করেই তার নামটা এখানে উচ্চারণ করছি না। আমি যে কারণে এই লেখাটি লিখছি সেখানে তার পরিচয়টি হবে একজন প্রতিবন্ধী মানুষ, আমি সেটা চাই না। তার সত্যিকারের পরিচয় সে ঠিক আমাদের মতো একজন মানুষ, যখন সে রকমভাবে পরিচয় দিই তখন তার নাম লিখতে আমার কোনো দ্বিধা হবে না।) যাই হোক একসময় মেয়েটির সাথে আমার দেখা হলো, তখন আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম তার যে এত লেখালেখি, এত বড় সংগঠন, এত চমৎকার একটি আন্দোলন, সমাজের জন্যে তার চেয়ে এত বড় অবদান তার সব কিছু করেছে শুধুমাত্র একটি আঙুল দিয়ে। সারা শরীরের শুধু এই আঙুলটি দিয়ে কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, এই মেয়েটিকে দেখে নিজেকে পুরোপুরি অকিঞ্চিৎকর একজন মানুষ বলে মনে হয়েছে। শুধুমাত্র একটা সচল আঙুল দিয়ে একজন মানুষ যদি এত কিছু করতে পারে তাহলে আমরা আমাদের সারা শরীর হাত পা মাথা ঘাড় বুক পেট সব কিছু নিয়ে কেন কিছু করতে পারি না? এই মেয়েটি যদি কোনো অভিযোগ না করে তার সব কাজ করে যেতে পারে তাহলে আমরা কেন সারাক্ষণ জগৎসংসার দেশ নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করে অভিযোগ করি? আমাদের সমস্যাটা কোথায়?

বেশ কিছুদিন আগে আমি আরো একটি টেলিফোন পেয়েছিলাম, যে আমাকে ফোন করেছিল সেও ছিল একটি মেয়ে। গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম বয়স বেশি নয়, কিন্তু তার কথা বুঝতে আমার একটু সমস্যা হচ্ছিল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল তার গলার স্বরটা কেমন যেন একটু যান্ত্রিক। মেয়েটি তখন আমাকে এসএমএস পাঠাল এবং সেখান থেকে জানতে পারলাম সে শুধু হুইলচেয়ারে নয়, সে পাকাপাকিভাবে একটা বিছানায় আবদ্ধ একজন মানুষ। কিছুদিন আগেও সে পুরোপুরি সুস্থ-সবল, ছটফটে দুরন্ত একটি মেয়ে ছিল, কোনো একটি গণিত অলিম্পিয়াডে তার সাথে নাকি আমার একবার দেখাও হয়েছিল। কোনো একভাবে সে তার স্কুলের চারতলা থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে পড়ে কারো বেঁচে থাকার কথা নয়, সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু সে চিরদিনের জন্যে একটা বিছানায় আবদ্ধ হয়ে পড়ল, নিঃশ্বাসটুকুও নিতে হয় যন্ত্র দিয়ে। সেই মেয়েটিও তার একটি মাত্র আঙুল ব্যবহার করে কবিতা লিখত, সেই কবিতা সে আমার ছে পাঠিয়েছিল। আমাকে বলেছিল এই শারীরিক অবস্থা নিয়ে সে নাকি ছবিও আঁকত। বিছানার মাঝে আটকে থাকা একটা কিশোরীর সামনে বাইরের পৃথিবীর জানালা কীভাবে খুলে দেওয়া যায় আমি যখন সেটা ভাবছি তখন তার একজন বান্ধবী আমাকে জানাল সেই মেয়েটি আর বেঁচে নেই। যে মানুষটিকে কখনো সামনাসামনি দেখিনি তার জন্যে দুঃখে আমার বুকটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল।

২.

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা কত? আমি জানি সংখ্যাটি শুনলে সবাই চমকে উঠবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর বিশ্ব ব্যাংক-এর ২০১১ সালে জরিপ অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে প্রতিবন্ধী মানুষ হচ্ছে শতকরা ১৫ জন। (সত্তরের দশকেও সংখ্যাটি ছিল শতকরা ১০ জন।) সারা পৃথিবীতে যে হিসেব বাংলাদেশ তার বাইরে থাকবে সেটা হতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কী, যে দেশ একটু দরিদ্র সেই দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বেশি। কাজেই আমরা যদি বাংলাদেশের জন্যেও এই ১৫ শতাংশ সংখ্যাটি ধরে নিই তাহলে এখানে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ। সংখ্যাটি কত বড় অনুমান করার জন্যে বলা যায় অস্ট্রেলিয়ায় যদি এই সংখ্যক মানুষকে প্রতিবন্ধী হতে হয় তাহলে সেই দেশের প্রত্যেকটা মানুষকে প্রতিবন্ধী মানুষ হতে হবে!

আমি যখন প্রথমবার এই সংখ্যাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি তখন আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। আমাদের দেশে আদিবাসীদের সংখ্যা ২০ লক্ষের কাছাকাছি, আমরা এই মানুষগুলোর অধিকারের জন্যে সব সময় সোচ্চার থাকি। সরকার যখন ঘোষণা দিল এই দেশে আদিবাসী নেই আমরা তখন তীব্র ভাষায় সরকারের সমালোচনা করেছিলাম। এই দেশের প্রায় নব্বই ভাগই এখন মুসলমান, বাকি অল্প যে কজন ভিন্ন ধর্মের মানুষ আছে তাদেরকে নিয়ে যেন এ দেশে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকে আমরা সব সময়েই সেটা লক্ষ রাখার চেষ্টা করি। অথচ সংখ্যায় তাদের থেকে অনেক বেশি হচ্ছে প্রতিবন্ধী মানুষ, কিন্তু তারা কি পূর্ণাঙ্গ মানুষের মর্যাদা নিয়ে এ দেশে আছে নাকি একটা ঘরের ভেতর সবার চোখের আড়ালে একধরনের গভীর হতাশায় ডুবে আছে সেটা নিয়ে আমরা কখনো মুখ ফুটে কথা বলি না! এর চাইতে বড় পরিহাস আর কী হতে পারে!

প্রতিবন্ধী মানুষ নিয়ে আমাদের ভেতরে এখনো কোনো সচেতনতা নেই। বরং উল্টোটা আছে, তাদের সম্পর্কে আমাদের নানা রকম নেতিবাচক ধারণা আছে। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমরা প্রথম একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ভর্তি করেছিলাম তখন বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব বুড়ো বুড়ো প্রফেসর আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে নানা ধরনের হাইকোর্ট দেখাতেন, তারা রীতিমতো আঁতকে উঠেছিলেন। "কানা খোঁড়া" মানুষ ভর্তি করে আমরা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন ঝামেলা তৈরি না করি সে জন্যে আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রথমবারের মতো একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ভর্তি হচ্ছে, তাও সেটি কোনো কোটায় নয়, নিজের যোগ্যতায়, সেটি নিয়ে আমার ভেতরে একধরনের আনন্দ ছিল এবং আমার মনে আছে একাডেমিক কাউন্সিলে বুড়ো বুড়ো প্রফেসরদের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিবন্ধী ছাত্রটি ভর্তি করা হয়েছিল। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গি যদি এ রকম ভয়াবহ হয় তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে সেটা

অনুমান করা কঠিন নয়। এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। একজন প্রতিবন্ধী ছাত্র যেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকভাবে পড়তে পারে সে জন্যে নীতিমালা আছে, আমরা তাদের প্রয়োজনটুকু দেখার চেষ্টা করি।

কিন্তু এই কথাটি কি পুরোপুরি সত্যি? আমাদের দেশে আইন করা হয়েছে প্রত্যেকটা নূতন বিল্ডিংয়ে হুইল চেয়ারে করে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাথরুমগুলোতে যেন হুইল চেয়ার নিয়ে একজন প্রতিবন্ধী মানুষ ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের এত আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিল্ডিংয়ে সেটি করা হয়নি। আমার মনে আছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি টিম এসেছে যার একজন হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে। অত্যন্ত দক্ষ প্রোগ্রামার হিসেবে সেই টিম একটা পুরস্কার পেয়ে গেল, এখন তাদের মঞ্চে গিয়ে পুরস্কার নিতে হবে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করা আমাদের অডিটরিয়ামের রাজসিক মঞ্চ কিন্তু হুইল চেয়ারে করে আসা সেই ছেলেটির মঞ্চে ওঠার কোনো জায়গা নেই। লজ্জায় আমার মনে হলো মাটির সাথে মিশে যাই। তার বন্ধুরা তাকে হুইল চেয়ারসহ মঞ্চে তুলে নিয়ে এলো, সেখানে বন্ধুদের ভালোবাসা আছে কিন্তু পুরস্কার পাওয়া তরুণের সম্মানটুকু নেই। আমি তখন তাকে কথা দিয়েছিলাম পরের বছর সে যদি আসে আমরা তাহলে তার জন্যে একটা র‍্যাম্প-এর ব্যবস্থা করে রাখব। (সত্যি কথা বলতে কী, পরের বছরও আমি বিষয়টা ভুলে গিয়েছিলাম। একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন মনে পড়েছে তখন তাড়াতাড়ি করে একজন কাঠমিস্ত্রিকে ডেকে খুব দায়সারা একটা র‍্যাম্প তৈরি করে রেখেছিলাম, যেন সেটা দিয়ে তার বন্ধুরা হুইল চেয়ারটাকে খানিকটা হলেও সম্মান নিয়ে উপরে নিয়ে যেতে পারে।)

নূতন একটা বিল্ডিং তৈরি করতে যত টাকা দরকার হয় তার তুলনায় সেই বিল্ডিংয়ে হুইল চেয়ারে ওঠার ব্যবস্থা করে দেওয়া বা বাথরুমে হুইল চেয়ার নিয়ে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে বলতে গেলে কিছুই খরচ নেই, তারপরেও সেটা করা হয় না। দেশে এটা নিয়ে একটা আইন তৈরি করা হয়েছে, আমরা বেশিরভাগ সেই আইনটার কথা জানিই না! বিল্ডিংয়ে ঢোকা শুধু একটা অংশ, যে মানুষটি হুইল চেয়ারে চলাফেরা করে তার কোনো একটা বিল্ডিংয়ে ঢোকার আগে অনেক রাস্তা পাড়ি দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে রাস্তাঘাট, যানবাহন কোনো কিছুতেই কিন্তু হুইল চেয়ারে করে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। যেসব দেশ প্রতিবন্ধী মানুষবান্ধব সেখানে গেলে একধরনের মুগ্ধতা নিয়ে দেখতে হয় তারা কত গভীর মমতা নিয়ে এই মানুষগুলোর চলাফেরার ব্যবস্থা করে রেখেছে। সেখানে সাধারণ মানুষের চলাফেরা করার যেটুকু অধিকার হুইল চেয়ারে করে একজন মানুষের তার সমান অধিকার। রাস্তাঘাট, ফুটপাত সব জায়গায় হুইল চেয়ার নিয়ে যাওয়া যায়, হুইল চেয়ারের সুবিধেটুকু বড় বড় স্পষ্ট

সাইন দিয়ে বলে দেওয়া থাকে। পার্কিংলটে হুইল চেয়ারের যাত্রীদের গাড়ি পার্কিংয়ের আলাদা জায়গা থাকে। বাসট্রেনে তাদের ওঠার ব্যবস্থা থাকে, ওঠার পর হুইল চেয়ারে বসে যাওয়ার আলাদা জায়গা থাকে। একজন মানুষ তার বাসা থেকে হুইলচেয়ারে রওনা দিয়ে সারাদিন পুরো শহর চষে বেড়িয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারবে, তাকে একটিবারও অন্য কারো সাহায্য নিতে হয় না। আমাদের পাশের দেশ ভারতবর্ষে যদি এর মাঝেই প্রতিবন্ধী মানুষদের যাতায়াতের জন্যে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে তাহলে আমরা কেন পারব না?

একটি প্রতিষ্ঠানকে কিংবা একটা শহরকে এমনকি একটা দেশকেও যদি হুইল চেয়ারে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিতে হয় তার জন্যে এমন কিছু বাড়তি টাকা-পয়সার দরকার হয় না। যেটুকু দরকার হয় সেটি হচ্ছে, একটুখানি ইচ্ছে বা একটুখানি সিদ্ধান্ত। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে ক্ষুদ্র টাকা-পয়সা খরচ করে সবার জন্যে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা হবে তার প্রতিদানে যেটুকু পাওয়া যাবে তার মূল্য সেই টাকা-পয়সার সহস্র গুণ বেশি। প্রতিবন্ধী মানুষ বলে আমরা যাদের চোখের আড়াল করে রেখেছি, সমাজের বোঝা বলে আমরা যাদের অবহেলা করে এসেছি, তাদের কিন্তু আসলেই সবার চোখের আড়ালে সমাজের বোঝা হিসেবে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি এই দেশের পথে-ঘাটে-বাসে-ট্রেনে গাড়িতে একজন হুইল চেয়ারে করে নিজে নিজে যেতে পারে তাহলে আমরা অবাক হয়ে দেখব তাদের আর পরিবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে না, তারা নিজেরাই অনেক সময় নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারবে। এই দেশের দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ যদি কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তাদেরকে ঘরের মাঝে আটকে রেখে চোখের আড়াল করে ফেলার চেষ্টা করার কোনো মানে হয় না। আমাদের তাদের মুক্ত করে দিতে হবে। এই বিশালসংখ্যক মানুষের যতজনকে সম্ভব পরিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার দিতে হবে।

৩.

কিছুদিন আগে একজন ব্রিটিশ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মেয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কাজগুলো দেখতে এসেছিল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে জানতে পারলাম সে গণিতে লেখাপড়া করে এসেছে। যে মানুষটি চোখে দেখতে পায় না সে কেমন করে গণিত নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে সেটি নিয়ে আমার কৌতূহল ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল, চোখে দেখতে পায় না বলে ভুল করে সে অন্য একটি ক্লাসরুমে ঢুকে গিয়েছিল, সেখানে সে শুনতে পেল গণিত পড়ানো হচ্ছে, তার কাছে মনে হলো বিষয়টা খুব চমৎকার। তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের গিয়ে জানাল সে গণিতে স্নাতক পড়তে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপকেরা বলল, যে মানুষ চোখে দেখতে পায়

না সে কখনো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের গণিতে স্নাতক ডিগ্রি নিতে পারবে না। মেয়েটি বলল, "এটা তোমাদের একটা থিওরি, আমাকে দিয়ে এই থিওরির একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখো তোমাদের থিওরিটা সঠিক কি না!" কাজেই প্রফেসররা তাকে গণিত পড়তে দিতে বাধ্য হলো এবং সে সকল থিওরিকে ভুল প্রমাণিত করে স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বের হয়ে এলো।

আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, লন্ডন শহরে তুমি কেমন করে যাতায়াত করো? সে বলল সে সম্পূর্ণ এক একা পুরো লন্ডন শহর চষে বেড়ায়, সে জন্যে তার দরকার ছোট একটা কম্পিউটার ট্যাবলেট, আর কিছু নয়!

এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির এমন কিছু নূতন আবিষ্কার এখন সবার হাতে হাতে চলে এসেছে, যেগুলো প্রতিবন্ধী মানুষের সামনে একেবারে নূতন একটি দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। একটি উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মানুষের প্রয়োজন ভিন্ন, কাজেই এর সমাধানও হতে হবে ভিন্ন আর সেই কাজটুকু করতেও হবে আমাদের নিজেদের। এর মাঝে সেটি শুরু হয়েছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সেটা করার চেষ্টা করি, অন্যরাও যদি করে আমার মনে হয় অনেক কিছু হতে পারে।

৪.

প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন নিয়ে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই তাই তাদের লেখাপড়া নিয়ে আমাদের আগ্রহ থাকবে সেটি নিশ্চয়ই আমরা আশা করতে পারি না। প্রতিবন্ধী বাচ্চারা যতটুকু সম্ভব সাধারণ বাচ্চাদের সাথে লেখাপড়া করে বড় হবে, সেটা সবার স্বপ্ন। এই মুহূর্তে তার ব্যবস্থা নেই কিন্তু আইন করে সেই ব্যবস্থা করা হবে আমরা তার অপেক্ষা করে আছি। যেটি করা কঠিন সেটা করতে সময় লাগতে পারে। কিন্তু যেটি করা সোজা সেটি যদি করা না হয় তাহলে আমরা হতাশা অনুভব করতে থাকি। যেমন ধরা যাক ব্রেইল বইয়ের ব্যাপারটি, কথা ছিল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের জন্যে ব্রেইল বই দেওয়া হবে কিন্তু সেটি দেওয়া হলো না। তখন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলোর সাথে সাথে আমরা অন্ততপক্ষে পাঠ্য বইগুলোর সফটকপির জন্যে NCTB-এর সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করলাম যেন নিজের উদ্যোগে সেগুলোকে ব্রেইল করে নেওয়া যায়। বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেকটা পাঠ্যবই পিডিএফ করে তাদের ওয়েবসাইটে রাখা আছে, যে কেউ সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। কিন্তু ব্রেইল ছাপানোর জন্যে যে রকমভাবে টেক্সট ফাইল দরকার সেটি কিছুতেই পাওয়া গেল না।

বিষয়টি যখন জানাজানি হলো তখন এই দেশের তরুণেরা নিজেরা সেই বইগুলো নূতন করে টাইপ করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রতি বছর এই দেশের বাচ্চারা

নূতন বই হাতে মুখে বিশাল একটা হাসি নিয়ে বাড়ি যায়—এর চাইতে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই। ঠিক একই সময় সব রকম চেষ্টা করেও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্যে পুরো ক্লাসের জন্যে একটা করে ব্রেইল বই আমরা তুলে দিতে পারি না! শুধু তা-ই নয়, যখন প্রক্রিয়াটা আমরা নিজেরাই করতে চাই তখনো NCTB থেকে আমরা সহযোগিতা পাই না।

৫.

আগামী ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস। আমাদের দেশের মিডিয়ারা দিনটিকে গুরুত্ব দিয়ে নিয়ে সবার ভেতরে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি করবেন বলে খুব আশা করে আছি। প্রতিবন্ধী মানুষদের আমাদের পাশাপাশি নিয়ে এসে এক সাথে কাজ করার গন্তব্যটুকুতে আমরা এখনো পৌঁছাইনি। যাত্রা শুরু করলে একসময় পৌঁছাব, আমরা এখানো যাত্রা শুরু করিনি। সবাই মিলে যাত্রাটুকু শুরু করি, কাজটুকু খুবই সহজ, শুধু মনে রাখতে হবে প্রতিবন্ধী মানুষেরা আসলে প্রতিবন্ধী নয়, আসলে তারা মানুষ।

[নভেম্বর ২২, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

ডিসেম্বরের প্রথম প্রহর

১.

বেশ কিছুদিন থেকে বাংলাদেশের সব মানুষের মতো আমিও আটকা পড়েছি। প্রথমে হরতালে আটকা পড়েছিলাম এখন অবরোধে আটকা পড়েছি। দুটোর মাঝে পার্থক্যটা আমার কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। হরতাল শুরু হওয়ার আগেই গাড়ি পোড়ানো হতো, অবরোধের আগেও গাড়ি পোড়ানো হয়। হরতালে গাড়ি পোড়ানোর সময় ভেতরে অনেক সময় যাত্রীরা থাকে, অবরোধেও তাই। সিলেটে থাকি, আমার মা ঢাকা থাকেন। অন্য কোনো কাজ না থাকলেও শুধু মাকে দেখার জন্যে ঢাকা যাই, এখন যেহেতু ঢাকা যেতে পারছি না দেখা করতে পারছি না, তাই টেলিফোনে কথা হয়। আমার মা জানেন আমার বাসায় টেলিভিশন নেই তাই টেলিভিশনে কী কী দেখানো হয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে জানান। ইদানীং আমার মা টেলিভিশন না দেখার জন্যে আমার ওপর খুব বিরক্ত। মোটামুটি স্পষ্ট করে বললেন, "সারা দেশে কী তাণ্ডব হচ্ছে, কী নৃশংসতা হচ্ছে নিজের চোখে দেখবি না, পালিয়ে বেড়াবি, এটা হয় না। তোকে দেখতে হবে—এই দেশে কী হচ্ছে নিজের চোখে তোকে দেখতে হবে।"

তারপরেও টেলিভিশনে সেই ভয়াবহ ঘটনা দেখি না, ইন্টারনেটে খবর পড়ি, খবরের কাগজে ছবিগুলো দেখে দ্রুত পৃষ্ঠা উল্টিয়ে ফেলি। গত কিছুদিন বাংলাদেশের খবরের কাগজে যে ছবি ছাপা হচ্ছে তার থেকে হৃদয়হীন নৃশংস অমানুষিক বর্বরতার ঘটনা এই দেশের মানুষ এত নিয়মিতভাবে দেখেছে বলে আমার জানা নেই। কোনটা বেশি বড় নিষ্ঠুরতা আমি এখনো নিশ্চিত নই, একেবারে সাধারণ মানুষকে—স্কুলের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে পথচারী কিংবা মহিলাদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা, নাকি যারা এটা করছে তাদের বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ না করে চুপচাপ এই ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে সমর্থন করে যাওয়া। রাজনৈতিক সহিংসতা বলে একটা শব্দ চালু আছে, আমরা জানতাম সেটি এক রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীকে করে

থাকে। এখন যেটাকে রাজনৈতিক সহিংসতা বলা হচ্ছে সেখানে রাজনৈতিক নেতা কর্মীর সংখ্যা খুব কম। বেশিরভাগ মানুষ সাধারণ মানুষ। আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো ভয়ংকর আর কী হতে পারে! যারা মারা যাচ্ছেন তাদের আপনজনদের হাহাকার আর ক্ষোভের কথাটা আমি চিন্তাও করতে পারি না। যারা বেঁচে আছেন তাদের সেই অমানুষিক কষ্টের কথা কি বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব? যারা রাজনীতি করেন তারা সব কিছুকে পরিসংখ্যান দিয়ে বিশ্লেষণ করে ফেলতে পারেন, আমরা পারি না। একটা মাত্র মৃত্যু কিংবা একটা মাত্র নিষ্ঠুরতার কথা আমাদের পীড়ন করতে থাকে, এতগুলো আমরা কেমন করে সহ্য করব?

আমরা সবাই গণ-আন্দোলনের কথা জানি, যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে আর কিছু করা যায় না তখন সাধারণ মানুষ পথে নেমে আসে। কিন্তু আন্দোলনের নামে এই নৃশংসতার কথা আমরা কি আগে কখনো দেখেছি? যারা মানুষকে পুড়িয়ে মারছে তারা যখন বাড়ি ফিরে যায় টেলিভিশনে সেই ভয়াবহ ঘটনাগুলো দেখে তখন কি তাদের চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমলে করে ওঠে? সম্পূর্ণ নিরপরাধ মানুষগুলো যখন যন্ত্রণায় ছটফট করে, তাদের আপনজন যখন হতাশায়, ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না তখন কি এই মানুষগুলো উল্লসিত হয়ে ভাবে তারা তাদের গন্তব্যে আরো একটু পৌঁছে গেছে? তাদের নেতা-কর্মীরা কি ফোন করে তাদের অভিনন্দন জানান? যখন দেখা হয় তাদের পিঠ চাপড়ে দেন? আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে।

যখন থেকে দেশে এই নূতন ধরনের সন্ত্রাস শুরু হয়েছে তখন আরো একটি বিচিত্র বিষয় আমার চোখে পড়তে শুরু করেছে। খবরের কাগজে প্রায়ই এমন ছবি দেখতে শুরু করেছি যেগুলো দেখে মনে হয় আমরা বুঝি নাটকের দৃশ্য দেখছি। সন্ত্রাসী এই কাজকর্মের এত নিখুঁত ছবি দেখে আমরা মাঝে মাঝে হকচকিয়ে যাই, দেখে মনে হয় সাংবাদিকরা যেন ভালো করে ছবিগুলো তুলতে পারেন বুঝি সে জন্যেই তাদের সামনে অনেক যত্ন করে ঘটনাগুলো ঘটানো হচ্ছে। বিশ্বজিৎ নামের সেই ছেলেটিকে যখন ছাত্রলীগের ছেলেরা প্রকাশ্য দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করল তখন সাংবাদিকরা এই দৃশ্যটি ক্যামেরায় ধারণ করার জন্যে এত সময় না দিয়ে ছেলেটিকে যদি বাঁচানোর চেষ্টা করতেন তাহলে সে বেঁচে যেত কি না এই চিন্তাটি মাঝে মাঝেই আমার মাথায় উঁকি দেয়।

কেভিন কার্টার নামে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফটোগ্রাফার ছিলেন, নব্বইয়ের দশকে এই ফটোগ্রাফার তার একটি ছবির জন্যে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন। ছবিটি ছিল আফ্রিকার দুর্ভিক্ষের সময়ের ছবি, একটি শীর্ণ শিশু নিজেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে খাবারের সন্ধানে, পিছু পিছু তাকে অনুসরণ করছে একটি শকুন। দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার সেই ছবির জন্যে কেভিন কার্টার পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু একজন মানুষ হয়ে একটা শিশুকে রক্ষা না করে শকুনের সাথে ছবি তোলার জন্যে সারা পৃথিবীতে তার বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল সম্ভবত সে জন্যেই তার কয়েক মাস পরে এই ফটোগ্রাফার আত্মহত্যা করেছিলেন।

একজন ফটোগ্রাফার চমকপ্রদ একটা ছবি তোলার জন্যে সব সময় চোখ-কান খোলা রাখেন, কিন্তু সেই ছবি তোলার সুযোগ করে দিয়ে যদি সন্ত্রাসীদের গোষ্ঠী সেই ফটোগ্রাফার, সেই পত্রিকা, পত্রিকার সম্পাদক সবাইকে ব্যবহার করে নিজের উদ্দেশ্যে হাসিল করে ফেলে তাহলে তার দায়িত্ব কে নেবে? আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো কী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে তারা দুর্বৃত্ত, সন্ত্রাসী, হত্যাকারীদের মানুষকে আতঙ্কিত করে তোলার প্রক্রিয়াকে গায়ে পড়ে সাহায্য করছে না?

২.

এই দেশে আজকাল মানুষের নিরাপত্তা নেই, যে কোনো মানুষ যে কোনো সময়ে আক্রান্ত হতে পারে। গত সপ্তাহে আমাদের ক্যাম্পাসে একসাথে অনেকগুলো ককটেল ফুটল। একটা আমাদের বাসার বারান্দায়। যখন সেটি ফাটানো হয়েছে তখন আমার স্ত্রী তার কয়েক ফুট দূরে, মাঝখানে দেওয়াল-দরজা থাকার জন্যে বড় ধরনের কিছু ঘটেনি। কিছুক্ষণের ভেতরেই সবাই বাসা থেকে বের হয়ে এলো। দেখতে দেখতে শত শত ছাত্র, ভয় কিংবা আতঙ্কের বদলে বরং একটা উৎসব উৎসব ভাব। খুব কাছেই মেয়েদের হল, ককটেলের শব্দ তারা খুব ভালোমতো পেয়েছে, টেলিফোনে আমাদের জানানো হলো তাদের কয়েকজন বের হতে চায়। প্রক্টর, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক সবাই আছেন, তারা ভাবল বরং আমরাই মেয়েদের সাহস দিয়ে আসি।

মেয়েদের হলের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সব মেয়ে বের হয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। একজন বলল, "স্যার, খুব ভয় লাগছে।" আমি বললাম, "ভয় লাগার কী আছে? এ দেশে জন্মেছ একটু সহ্য করো।" মেয়েরা তখন বাধা দিয়ে বলল, "না, না, স্যার, আমাদের নিজেদের জন্যে একটুও ভয় লাগছে না। আপনার আর ম্যাডামের জন্যে ভয় লাগছে।"

যখন এই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে একদিন যেতে হবে এই ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা ছেড়ে কেমন করে যাব আমি জানি না। এরা আমাদের নূতন প্রজন্ম, ডিসেম্বর মাস এলে আমার এই দেশের তরুণ প্রজন্মের কথা মনে পড়ে। এই দেশটি তরুণ প্রজন্মের দেশ, তরুণ প্রজন্ম তীব্র আবেগ আর ভালোবাসায় এই দেশটির জন্ম দিয়েছিল, আবার তীব্র আবেগ আর ভালোবাসা দিয়ে এই দেশটিকে রক্ষা করবে, এই দেশটিকে গড়ে তুলবে।

সেদিন ভোরবেলা একটা টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক আমার অফিসে চলে এসেছেন ইন্টারভিউ নিতে। ডিসেম্বর মাসে তারা মুক্তিযুদ্ধের ওপর অনুষ্ঠান করবেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার স্মৃতি জানতে চান, আমার কথা শুনতে চান।

আমি সেই টেলিভিশন চ্যানেলকে বলেছি, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অনেক বীরত্ব আর অনেক বড় অর্জনের ইতিহাস, কিন্তু সেটা একই সাথে অনেক বড় একটা

আত্মত্যাগের ইতিহাস। আত্মত্যাগের এত বড় ইতিহাস পৃথিবীর অন্য কোথাও এভাবে আছে কি না আমার জানা নেই। এই মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা বাংলাদেশে একটি পরিবারও ছিল না যার কোনো একজন আপনজন কিংবা কাছাকাছি একজন মানুষ মারা যায়নি। দেশ যেদিন মুক্ত হয়েছিল সেই অবিশ্বাস্য আনন্দের পাশাপাশি অনুভূতিটি ছিল স্বজন হারানো একটি গভীর বেদনার অনুভূতি।

আমি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিককে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম আমাদের প্রজন্ম সম্ভবত সবচেয়ে সৌভাগ্যবান প্রজন্ম। ভয়ংকর দুঃসময়ে কীভাবে টিকে থাকতে হয় আমরা জানি। তার চাইতে বড় কথা, একাত্তরের সেই ভয়ংকর দুঃসময়ে এই দেশের মানুষের সবচেয়ে সুন্দর রূপটি বের হয়ে এসেছিল। গভীর ভালোবাসায় মানুষ তখন একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের প্রজন্ম মানুষের সেই রূপটি দেখেছে, আমরা তাই কখনো মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাই না। আমরা জানি অতি সাধারণ অকিঞ্চিৎকর একজন মানুষের ভেতরে একজন অসাধারণ মানুষ লুকিয়ে থাকে। প্রয়োজনের সময় তাকে বের করে আনা যায়। আমি জানি এটা হচ্ছে আমাদের শক্তি। জ্ঞানী-গুণী অল্প কয়জন সুশীল সমাজ আমাদের শক্তি নয়, অসংখ্য সাধারণ মানুষ আমাদের শক্তি। এই দেশে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ—আমাদের ভয় কী?

এই সাধারণ মানুষদের পথ দেখাবে নূতন প্রজন্ম। তাই আমি সব সময়ে তাদের মুখ চেয়ে থাকি, তারা কখনো আমাকে নিরাশ করে না। অল্প একটু সুযোগ দিলে তারা ম্যাজিক করে ফেলতে পারে, আমি সবিস্ময়ে সেটি দেখি। এই নূতন প্রজন্মকে আমি বারবার মনে করিয়ে দিতে চাই, কখনো যেন তারা হতোদ্যম না হয়, কোনো কিছু নিয়ে তারা যেন হতাশ না হয়। একাত্তরে অবিশ্বাস্য দানবের বিরুদ্ধে এই দেশের মানুষ বিজয় লাভ করেছিল শুধু একটি কারণে, তারা তাদের মনের জোর হারায়নি। এখনো তাদের মনের জোর হারালে চলবে না। আমাদের চারপাশে আমরা যেটি দেখছি সব কিছু সাময়িক। আমাদের তরুণদের ভেতরে যে শক্তি আছে তারা সব কিছু খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিতে পারবে, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি।

ডিসেম্বর মাস এলে আমার সেই তরুণদের কথা, কিশোরদের কথা মনে পড়ে। আমার সেই কিশোর বন্ধুরা যারা অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধ করে মারা গিয়েছিল। তারা এখনো কিশোর, এখনো তরুণ, তারা কোনো দিন বড় হবে না, আজীবন কিশোর থেকে যাবে। আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের বয়স বাড়ছে, আমাদের চুল পাকছে, কিন্তু সারাটি জীবন পরিশ্রম করেও আমরা কি সেই কিশোর-তরুণদের এক ফোঁটা রক্তের ঋণ শোধ করতে পারব?

আমাদের নূতন প্রজন্ম পারবে। শত বাধা-বিপত্তি, হরতাল-অবরোধ, সন্ত্রাস, অরাজকতা, ভায়োলেন্সের মাঝেও কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। যে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে রেখে দেওয়ার জন্যে একাত্তরে এই যুদ্ধাপরাধীরা এই দেশে নৃশংস

হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল সেই পাকিস্তানের এখন বাংলাদেশের সাথে তুলনা করার সুযোগ নেই! অমর্ত্য সেন স্পষ্ট করে বলেছেন মানুষের জীবনের মানের কথা চিন্তা করলে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ ভারত থেকেও বাংলাদেশের মানুষ অনেক ভালো আছে। খাদ্যশস্য বা স্বাস্থ্যসেবার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থাকে পৃথিবীর মানুষ এখন একটা বিস্ময় হিসেবে দেখে। সবচেয়ে বড় কথা, এই দেশের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে, এই প্রজন্ম যখন দেশের দায়িত্ব নেবে তখন আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে কার সেই ক্ষমতা আছে?

এই মুহূর্তে খবরের কাগজ খুলে যখন একটি যন্ত্রণাকাতর শিশুর মুখ দেখি, একজন মায়ের কান্না দেখি তখন মনটা ভারী হয়ে যায়। এটি ডিসেম্বর মাস, এই মাসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক সব দুঃখ-কষ্ট দূর করে আমাদের সেই তরুণ-কিশোর মুক্তিযোদ্ধার রক্তের ঋণ আমরা শোধ করব।

আমাদের তরুণ প্রজন্ম নিশ্চয়ই করবে।

[ডিসেম্বর ৬, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

তারুণ্যের দেশ : বাংলাদেশ

বাংলাদেশ অন্য দশটা দেশ থেকে ভিন্ন—তার কারণ এই দেশটার সব কিছুতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে তরুণরা। সেই বাহান্ন সাল থেকে শুরু হয়েছে—ভাষা আন্দোলন করেছে ছাত্ররা, তাদের সাথে অন্য সবাই যোগ দিয়েছে। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনেও বড় ভূমিকা রেখেছে ছাত্ররা। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলনের পাশাপাশি ছিল ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলন (তার একটা দফা আসলে ছয় দফা) সেটা আমার জানামতে ছিল এই দেশের সবচেয়ে কার্যকর একটা আন্দোলন। সেই আন্দোলনগুলো দেখতে দেখতে চোখের সামনে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপ নিয়ে নিল। একটা দেশের জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীত খুব বড় ব্যাপার—বাংলাদেশের এই দুটো বিষয়েই ঠিক করেছে তরুণরা! একাত্তরের পঁচিশে মার্চ যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই দেশে গণহত্যা শুরু করে স্বাধীনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে চাইল তখন এই দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ আবার হাতে অস্ত্র তুলে নিল, স্বাধীনতার যুদ্ধ রূপ নিল মুক্তিযুদ্ধে। যারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ তারা হিসেব করে বের করেছিলেন এই মুক্তিযুদ্ধের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমেরিকা, চীন, মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশ পাকিস্তানের সাথে। ভারতবর্ষের নিজেরই অবস্থা ভালো না, এক কোটি শরণার্থী নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। দূর থেকে এক সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করবে? একটা ভয়ঙ্কর পেশাদার সেনাবাহিনী—যাদেরকে যেভাবে খুশি যত ইচ্ছা মানুষ খুন করার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, কারো কাছে জবাবদিহিতা নেই। বোঝানো হয়েছে ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে এই যুদ্ধ, তাই তাদের ভেতরে কোনো অপরাধবোধ নেই, বরং পরকাল গুছিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় বাড়িঘর লুট করে ইহকাল গুছিয়ে নেওয়া যায়, গণিমতের মাল হিসেবে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা যায়, এত আনন্দের যুদ্ধ করার সুযোগ কোথায় পাওয়া যাবে? তার ওপর এই দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণিত প্রজাতি রাজাকার-আলবদর তৈরি হয়েছে, তারা এই পাকিস্তানি মিলিটারিদের হাতে ধরে বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। পুরো দেশে বিভীষিকা আর

হাহাকার। সেই সময়েও এই তরুণরা দাঁতে দাঁত কামড়ে যুদ্ধ করে গেছে। তরুণদের পুরোপুরি যুক্তিহীন আবেগনির্ভর দেশের জন্যে ভালোবাসার কারণে মাত্র ৯ মাসের মাথায় দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি যখন পেছনে ফিরে তাকাই তখন অবাক হয়ে ভাবি, যদি এই দেশের তরুণরা দেশকে এ রকম মাত্রাছাড়া লাগামহীন ভালোবাসা না দিত তাহলে আমাদের কী হতো?

এখনো আমি একধরনের বিস্ময় নিয়ে দেখি এই দেশের অর্জনের বড় অংশগুলো আসছে তরুণদের কাছ থেকে। আমার বড় একটা দুঃখ ছিল বাংলাদেশের নামের উচ্চারণ নিয়ে, কেউ শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে পারে না। এত সুন্দর দেশের নামটি সব সময় উচ্চারণ করে "ব্যাংলাডেশ" বলে। প্রথম শুদ্ধ উচ্চারণ শুরু হলো ক্রিকেটের মাঠ থেকে। যে কাজটি আমরা কখনো করতে পারিনি—কম বয়সী কয়েকজন ক্রিকেট খেলোয়াড় আমাদের সেটি উপহার দিল। এখন সবাই আমার দেশের নামটি সঠিকভাবে উচ্চারণ করে।

আমাদের দেশের অর্থনীতির বড় অংশটুকুও আসে তরুণদের থেকে। যদিও আমরা শিক্ষিত বড় মানুষেরা দেশ নিয়ে নানা ধরনের ভালো ভালো কথা বলি কিন্তু দেশের অর্থনীতিটা চালিয়ে নিচ্ছে দেশের কৃষকেরা, দেশের প্রবাসী শ্রমিকরা আর গার্মেন্টস শ্রমিকরা। কৃষকদের মাঝে সম্ভবত সব বয়সী মানুষেরা আছে কিন্তু প্রবাসী শ্রমিকদের মাঝে তুলনামূলকভাবে কম বয়সী মানুষ বেশি। যে কোনো দিন কোনো এয়ারপোর্টে গেলেই সেটা চোখে পড়ে। মায়ের আলিঙ্গন থেকে চোখ মুছতে মুছতে একজন তরুণ বিদায় নিচ্ছে। গার্মেন্টসের মেয়েদের কথা নিশ্চয়ই কাউকে মনে করিয়ে দিতে হবে না, যে কোনো দিন ভোরবেলা রাস্তার দিকে তাকালেই দেখা যাবে হাজার হাজার কম বয়সী মেয়েরা কথা বলতে বলতে, গল্প করতে করতে, হাসতে হাসতে কাজে যাচ্ছে। আমরা যখন বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়ের কথা বলি তখন কীভাবে কীভাবে যেন দেশের এই খেটে খাওয়া কম বয়সী তরুণদের কথা ভুলে যাই। আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মোবাইল টেলিফোনের বিজ্ঞাপনের তরুণ-তরুণীদের। কিন্তু এর বাইরেও এই দেশে অসংখ্য তরুণ-তরুণী আছে, চোখের আড়ালে থাকা এই তরুণ-তরুণী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটা আমাদের মনে থাকে না। (আমরা এই দেশের কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীদের জন্যে কত কিছু করার চেষ্টা করি, সব সময়েই মনে হয় প্রায় এই একই বয়সী এই কিশোরী আর এই তরুণীদের জীবনের আনন্দের জন্যে কিছু করতে পারলাম না।)

দেশের এই খেটে খাওয়া তরুণ-তরুণীদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্যে আমাদের দেশের নূতন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা প্রস্তুত হচ্ছে। আমি সেটা নানাভাবে অনুভব করতে পারি। যারা কম্পিউটার সায়েন্সে লেখাপড়া করে তাদের জীবনের স্বপ্ন "গুগল"-এর মতো বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করার—আমি এ দেশের অনেকদের জানি যারা সুযোগ পেয়েও সেখানে যায়নি, দেশে একটা ফার্ম গড়ে তোলার কাজ করছে। কথা বলে আবিষ্কার করেছি বুকের ভেতর কোথায় জানি দেশের জন্যে একটা গভীর মমতা লুকিয়ে

আছে। যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের প্রায় সবাই আমাকে বলে গেছে, "স্যার, দেখবেন আমি একদিন ফিরে আসব। দেশের জন্যে কিছু একটা করব।" আমি জানি তাদের অনেকে ফিরে আসবে। তার কারণ আমি দেখেছি তাদের অনেকে ফিরে এসেছে, ভয়ে ভয়ে দুর্বলের মতো ফিরে আসেনি, অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে দৃপ্ত পায়ে ফিরে এসেছে। ইউরোপ-আমেরিকার সকল তরুণ এই দেশে ইন্ডাস্ট্রি দেওয়ার কাজ শুরু করেছে, আমি নিশ্চিত, দেখতে দেখতে আমরা আরো অনেক ব্যাপকভাবে দেখব। তার বড় একটা কারণ যারা সেটা করবে তারা শুধু সাফল্যের জন্যে করবে না, তারা করবে দেশের জন্যে ভালোবাসা থেকে।

তরুণেরা সব কিছু আমাদের থেকে ভালোভাবে করে। আমার কাছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে গণিত অলিম্পিয়াড। আমার কাছাকাছি মানুষ প্রফেসর কায়কোবাদ আর আমি বহুদিন থেকে দেশ থেকে একটা টিম তৈরি করে আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে পাঠানোর চেষ্টা করছিলাম, কিছুতেই করে উঠতে পারিনি। যখন আমাদের সাথে এই দেশের তরুণ প্রজন্ম যোগ দিল চোখের পলকে সব কিছু পাল্টে গেল—এখন গণিত অলিম্পিয়াড এই দেশের ছেলেমেয়েদের একটি খুব প্রিয় উৎসব। সারা দেশের ছেলেমেয়েরা খুব আগ্রহ নিয়ে সেখানে অংশ নেয়, তারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের পতাকা নিয়ে গণিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, পদক পায়। এই ছেলেমেয়েগুলো এখন রুটিনমাফিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা, তারা গ্রীষ্মের ছুটিতে চলে আসে অন্য বাচ্চাদের গণিত শেখাতে! এখন এই দেশে শুধু গণিত অলিম্পিয়াড নয়, আরো অনেক রকম অলিম্পিয়াড শুরু হয়েছে, আর এই দেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে শিশু-কিশোর-তরুণ-তরুণী যত আগ্রহ নিয়ে বিনোদনে মেতে ওঠে তার প্রায় সমান কিংবা বেশি আগ্রহ নিয়ে এই জ্ঞান-বুদ্ধির উৎসবে মেতে ওঠে।

আমি সব সময়েই মনে করি যে আমার মতো সৌভাগ্যবান মানুষ খুব বেশি নেই তার কারণ আমি সারা জীবন যা করার স্বপ্ন দেখেছি সেটা করতে পেরেছি—সেটি হচ্ছে তরুণদের পাশে থাকা। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেই, দুর্বোধ্য কোনো কিছু পড়াতে পড়াতে হঠাৎ করে যখন সুর পাল্টে বলি, "তোমাদের একটা গল্প বলি। একবার হয়েছে কী—" মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত চেহারা পাল্টে উৎসাহী হয়ে ওঠে, চকচকে চোখে তারা আমার গল্প শুনতে চায়। তাদেরকে নিজের জীবনের কোনো একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, তারা শুনে হেসে কুটি কুটি হয়, তখন এই কম বয়সী ছাত্রছাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভেতরে যে আনন্দের অনুভূতি হয় তার কোনো তুলনা নেই। আমি পৃথিবীর অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি, সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের নানা সৃজনশীল কাজ দেখেছি। এমআইটিতে গিয়ে সেবার দেখেছি একটা ছাত্র গভীর মনোযোগ দিয়ে ছোট একটা যন্ত্রকে পরীক্ষা করছে, যন্ত্রটি বাতাসে ভেসে আছে! সেদিন আমিও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম একটা রবোট আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। আমাদের দেশের

কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবোটের প্রতিযোগিতা হবে, সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সবাই মিলে রবোট তৈরি করছে! সন্ধ্যেবেলা এলে নিশ্চিতভাবে শুনতে পাই কোথাও থিয়েটারের রিহার্সেল হচ্ছে। গানের ক্লাস হচ্ছে। গভীর রাতেও বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় দেখি ওয়ার্কশপে সবাই মিলে কাজ করছে। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্যে নয়, নিজের শখে যন্ত্রপাতি তৈরি করছে। কী যে ভালো লাগে দেখে—আমি দিব্য চোখে দেখতে পাই এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে।

এই তরুণ প্রজন্মের কাছে আমি সব পেয়েছিলাম, শুধু একটা বিষয়ে আমার একটা দুঃখ ছিল। আমার কাছে মনে হতো মোবাইল ইন্টারনেটে তথ্যপ্রযুক্তির এই ভার্চুয়াল জগতে থেকে থেকে তারা বুঝি সত্যিকার জগৎ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন। দেশের কোনো একটা দুর্যোগের সময় তারা বুঝি ফেসবুকে একটা লাইক দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করে। আমি ভেবেছিলাম আমরা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে গভীর আবেগ দিয়ে অনুভব করি; তারা বুঝি সেভাবে করে না। আমি ধরেই নিয়েছিলাম সেই চল্লিশ বছর আগের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি তাদের কাছে একটি ইতিহাস মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। তারা সেটি নিজের চোখে দেখেনি, সেই আত্মত্যাগ, সেই বীরত্ব আর সেই অর্জনের কথা তাদের কাছে বুঝি কিছু তথ্য, তারা বুঝি সেটি কোনো দিন আমাদের মতো অনুভব করতে পারবে না।

কিন্তু তখন অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা ঘটে গেল। যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় সঠিকভাবে হচ্ছে না এই কারণে তারা যখন শাহবাগে দাঁড়িয়ে গেল আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম এই দেশের নূতন প্রজন্ম তীব্রভাবে আমাদের মতোই মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করে। সেই মুহূর্ত থেকে আমার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, হতাশা নেই, দুর্ভাবনা নেই। আমি জানি এই নূতন প্রজন্ম সঠিকভাবে এই দেশটিকে নিয়ে যেতে পারবে।

প্রতিদিন কত মন খারাপ করা ঘটনা ঘটে, আমি আর ভয় পাই না, আমি জানি আমাদের তরুণ প্রজন্ম সব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে আমাদের রক্ষা করবে।

এই দেশটা তরুণদের। তারা এনে দিয়েছে। তারা রক্ষা করবে। তারাই সামনে নিয়ে যাবে। আমি এখন নিশ্চিতভাবে জানি।

১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩

গ্লানি মুক্তির বাংলাদেশ

১.

গত সপ্তাহটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সপ্তাহ। একাত্তরের এই সপ্তাহে বাংলাদেশকে মুক্ত করার চূড়ান্ত যুদ্ধটি শুরু হয়েছে। আকাশে যুদ্ধ বিমান, বোমা পড়ছে, শেলিং হচ্ছে, গুলির শব্দ। আকাশ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে হ্যান্ডবিল বিলি করা হচ্ছে, ভারতীয় বাহিনী সেখানে লিখেছে, মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করো। আমরা বুঝতে পারছি আমাদের বিজয়ের মুহূর্ত চলে আসছে, তারপরেও বুকের ভেতর শঙ্কা, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে বঙ্গোপসাগর দিয়ে এগিয়ে আসছে। গত ৯ মাসে এই দেশে কত মায়ের বুক খালি হয়েছে তার হিসাব নেই। মানুষের প্রাণের কোনো মূল্য নেই, যখন খুশি যাকে ইচ্ছা তাকে নির্যাতন করা যায়, হত্যা করা যায়। চারিদিকে শুধু মৃতদেহ আর মৃতদেহ, আগুনে পোড়া ঘরবাড়ি। বিধ্বস্ত জনপদ, মানুষের হাহাকার। তার মাঝে জামায়াতে ইসলামীর তৈরি করা বদর বাহিনী খুঁজে খুঁজে এই দেশের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের বাড়ি থেকে তুলে নিচ্ছে। তাদের অত্যাচার করছে, চোখের ডাক্তারের চোখ তুলে নিচ্ছে, হৃদরোগের ডাক্তারদের হৃৎপিণ্ড বের করে আনছে তারপর হত্যা করে মৃতদেহ ছুড়ে ফেলছে। দেশটি যেন কোনো দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তারা সেটি নিশ্চিত করতে চায়।

সেই হত্যাকারীদের বিচার করে বিচারের রায় হয়েছে। প্রথম রায় কার্যকর হয়েছে সেই একই সপ্তাহে, ডিসেম্বরের ১২ তারিখ। আমি ৪২ বছর থেকে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম। শুধু আমি নই, আমার মতো স্বজন হারানো অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করেছিল। মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা করেছিল, নির্যাতিতরা অপেক্ষা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মানুষেরা অপেক্ষা করেছিল, আর অপেক্ষা করছিল এই দেশের নূতন প্রজন্ম। আমাদের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম, আমরা মুক্তিযুদ্ধকে তীব্র আবেগ দিয়ে

অনুভব করি, আমি কখনো কল্পনা করিনি এই দেশের নূতন প্রজন্মও মুক্তিযুদ্ধকে ঠিক আমাদের মতোই তীব্রভাবে অনুভব করবে। তাদের জন্মের আগে ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের সেই অবর্ণনীয় কষ্ট আর অকল্পনীয় আনন্দ তারা এত তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে সেটি আমাদের জন্যে এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নপূরণ।

গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কথা দিয়েছিল তাদেরকে নির্বাচিত করলে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। এই দেশের মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম তাদের কথা বিশ্বাস করে বিপুল ভোটে তাদের নির্বাচিত করে এনেছিল। সরকার তাদের কথা রেখেছে, ট্রাইব্যুনাল তৈরি করে বিচার করে বিচারের রায় দিয়ে রায় কার্যকর করতে শুরু করেছে। এই সরকারের কাছে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই, তাদের প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা, এই দেশকে গ্লানিমুক্ত করার জন্য। এত দিন যখন এই দেশের শিশুরা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করত, যারা এই দেশ চায়নি, যারা এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে, তারা কেমন করে এই দেশে এখনো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়? কেমন করে রাজনীতি করে, মন্ত্রী হয়? যে পতাকাটি ধ্বংস করার জন্যে হত্যাকাণ্ড করেছে, সেই পতাকা গাড়িতে লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়? আমি কখনো তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। মাথা নিচু করে থেকেছি। আর আমার মাথা নিচু করে থাকতে হবে না, কেউ আর আমাকে এই প্রশ্ন করবে না। সেই প্রশ্নের উত্তর তারা পেয়ে গেছে, সত্যি কথা বলতে কী, সেই প্রশ্নের উত্তরটি তারাই আমাদের উপহার দিয়েছে।

২.

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এই বিচারের কাজটি যতটুকু সহজ ছিল, এত দিন পর সেটি আর সহজ থাকেনি। যুদ্ধাপরাধীর দল ক্যান্সারের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, মিলিটারি শাসনের আড়ালে শক্তি সঞ্চয় করেছে, অর্থ উপার্জন করেছে, সেই অর্থ দিয়ে অপপ্রচার করেছে, দেশে-বিদেশে বন্ধু খুঁজে বের করেছে। হুবহু তাদের মুখের কথাগুলো আমরা বিদেশি গণমাধ্যমে শুনতে পেয়েছি। জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিধর দেশগুলো আমাদের সরকারকে শুধু মুখের কথা বলে বাধা দেয়নি, চোখ রাঙানি দিয়েছে। ১৯৭১ সালে যারা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এত বছর পরও তারা আবার সেই পাকিস্তানের পদলেহীদের পক্ষে! আমাদের অনেক সৌভাগ্য এই প্রচণ্ড চাপেও আমাদের সরকার দিশেহারা হয়নি, যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় কার্যকর করেছে। নির্বাচন নিয়ে আমাদের দেশের পেশাদার বুদ্ধিজীবীদের এখন প্রথম কাজ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এক হাত নিয়ে নেওয়া। সেটা আমি বুঝতে পারি কিন্তু যখন হরতাল, অবরোধ কার্যকর করার জন্য পেট্রলবোমা দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা হয়, ট্রেনের লাইন উপড়ে ট্রেনকে লাইনচ্যুত করা হয়, বাস-ট্রাককে যাত্রীসহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়, রাস্তা কেটে এলাকা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তখনো এই বুদ্ধিজীবী, পত্রিকার সম্পাদকেরা তার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর "অদূরদর্শিতা"কে দায়ী করেন তখন

আমি একটা ধন্দের মাঝে পড়ে যাই। এই কাজটি করে এই দেশের বড় বড় পত্রিকার বড় বড় সম্পাদকরা যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলোকে একধরনের নৈতিক সমর্থন দিয়ে ফেলছিলেন সেটি কি তারা একবারও বুঝতে পারছেন না? যে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব দেখে তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কথা সেটা দেখে তারা এই সরকারের ব্যর্থতার "অকাট্য প্রমাণ" পেয়ে উল্লসিত হচ্ছেন, এটি কেমন করে সম্ভব? আমি পেশাদার বুদ্ধিজীবী নই, বড় পত্রিকার সম্পাদক নই, বাজারে সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে কিংবা ন্যায়-অন্যায়ের মাঝখানে নিরপেক্ষ থাকার আমার কোনো চাপ নেই, তাই আমার যে কথাটি বলার ইচ্ছা করে সোজাসুজি বলতে পারি। নির্বাচন নিয়ে কী হবে সেটা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো নিষ্পত্তি করুক কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর না করার জন্যে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির হুমকিকে তোয়াক্কা না করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রায় কার্যকর করার জন্যে দেশের মানুষের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাটি বাস্তবায়ন করেছেন সে জন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা, তার প্রতি অভিনন্দন। তার বাবা বঙ্গবন্ধু আজ যদি বেঁচে থাকতেন নিশ্চয়ই তার মেয়ের বুকের পাটা দেখে খুশি হতেন।

৩.

১৯৭১ সালের পর আমি কখনো পাকিস্তানের কোনো জিনিস হাত দিয়ে স্পর্শ করিনি। অনেক টাকা বেঁচে যাবে জানার পরও যে প্লেন পাকিস্তানের ভূমি স্পর্শ করে যায় আমি কোনো দিন সেই প্লেনে উঠিনি। পাকিস্তানের ওপর দিয়ে যখন কোনো প্লেনে উড়ে যাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশটির ভূমি সীমার বাইরে না যাই ততক্ষণ নিজেকে অশুচি মনে হয়। পাকিস্তান দল যত ভালো ক্রিকেট খেলুক না কেন আমি তাদের কোনো খেলা দেখি না। (ষাটের দশকে টোকিও অলিম্পিকে স্বর্ণবিজয়ী পাকিস্তান হকি টিমের একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় পাকিস্তানি মিলিটারির অফিসার হিসেবে আমার বাবাকে একাত্তরে হত্যা করেছিল বলে আমি জানি।)

কেউ কেউ আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে ইতিহাসের একটা বিশেষ সময় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর একটা সাময়িক কাজকর্মের জন্যে সারা জীবন একটা দেশের সকল প্রজন্মকে দায়ী করা যায় না। কথাটি নিশ্চয়ই সত্যি, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। একাত্তরে আমি আমার নিজের চোখে পাকিস্তান নামের এই দেশটির মিলিটারির যে নৃশংস বর্বরতা দেখেছি, সেটি থেকে আমার কোনো মুক্তি নেই। দেশটি যদি নিজের এই নৃশংসতার দোষ স্বীকার করে নতজানু হয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইত তাহলে হয়তো আমার বুকের মাঝে ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকা আগুনের উত্তাপ একটু কমানো যেত। তারা সেটি করেনি, আমার বুকের ভেতর জ্বলতে থাকা আগুনের উত্তাপও কমেনি।

পাকিস্তানের যে রূপ দেখে আমরা অভ্যস্ত, দীর্ঘদিন পর এই দেশটির সেই রূপ আমাদের নূতন প্রজন্ম নূতন করে দেখার সুযোগ পেয়েছে। যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার

বিচারের রায় কার্যকর করার পর প্রথমে তাদের একজন মন্ত্রী প্রতিবাদ করেছে, তারপর তাদের পার্লামেন্ট থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিয়েছে। নিন্দা প্রস্তাবের সময় আলোচনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ। তারা জোর গলায় বলেছে, কাদের মোল্লা হচ্ছে একজন "সাচ্চা পাকিস্তানি, একাত্তরে সাচ্চা পাকিস্তানি থাকার জন্যেই তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে"। শাহবাগের তরুণ ছেলেমেয়েরা দিনের পর দিন এই কথাটি বলে স্লোগান দিয়েছে : "জামায়াতে ইসলাম মেড ইন পাকিস্তান!" যাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল জামায়াতে ইসলাম একাত্তরে এই দেশে কী করেছিল, এখন তাদের কারো ভেতরে কি আর কোনো সন্দেহ আছে?

পাকিস্তান থেকে বক্তব্য দেয়ার সময় তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেছে একাত্তরে "ঢাকা পতন" হওয়ার এত দিন পর সেই পুরানো "ক্ষত" নূতন করে উন্মোচন করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার "ঢাকা পতন" কথাটি নিয়ে আপত্তি আছে। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর মোটেও ঢাকার পতন হয়নি, পাকিস্তানের পতন হয়েছিল। ঢাকা কিংবা বাংলাদেশের সেদিন উত্থান হয়েছিল। "ক্ষত" কথাটি নিয়েও আমার গুরুতর আপত্তি আছে, এটি আমাদের জন্যে ক্ষত নয়, এটি পাকিস্তানের জন্যে "ক্ষত"—শুধু ক্ষত নয়, এটি হচ্ছে দগদগে ঘা। চল্লিশ বছরে সেই ঘা শুকায়নি, শত বৎসরেও সেই ঘা শুকাবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে পাকিস্তানকে পরাজয়ের এই দগদগে ঘা নিয়ে আজীবন বেঁচে থাকতে হবে। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, গণহত্যা এবং সবশেষে পরাজয়ের এই দগদগে ঘা তাদের অবশ্যই লুকিয়ে রাখতে হবে, কিন্তু আমাদের কেন সেটি লুকিয়ে রাখতে হবে? ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সেই বিজয় দিবস আমাদের ক্ষত নয়, সেটি আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার, আমরা শত সহস্রবার সেটি দেখতে চাই। তাই প্রত্যেক বছর এই বিজয় দিবস আমাদের কাছে আগের চাইতেও বেশি উদ্দীপনা নিয়ে ফিরে আসে।

পাকিস্তানের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, যদি থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের কিছু উপদেশ দিতাম। আমি তাদের বলতাম, তোমরা তোমাদের দগদগে ক্ষত দেখতে চাও না, খুব ভালো কথা, তোমরা চোখ বন্ধ করে থেকো। কিন্তু আমরা কী করব সেটি নিয়ে ধৃষ্টতা দেখাতে এসো না। ১৯৭১ সালে এই দেশ থেকে তোমাদের বিতাড়ন করে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, অনেক বিষয়ে আমরা সারা পৃথিবীর মডেল। একটু ধৈর্য ধরো—যখন দেখবে আমরা ঠিক ঠিকভাবে যুদ্ধাপরাধীর বিচার করে, রায় কার্যকর করে সারা পৃথিবীকে দেখাব কীভাবে সেটি করা যায় তখন সেটিও সারা পৃথিবীর একটা মডেল হয়ে যাবে। আপাতত তোমরা নিজেদের নিয়ে মাথা ঘামাও। মিলিটারির বি-টিম হয়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যা করছে, সেখান থেকে বের হতে পারো কি না দেখো। লেখাপড়া করতে চাইলে মেয়েদের মাথায় গুলি যেন করতে না পারে সেটা খেয়াল করো। সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস রপ্তানি করার যে সুনাম তুমি কুড়িয়েছ, সেই সুনাম থেকে মুক্ত হতে পারো কি না দেখো।

পাকিস্তানের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, যদি থাকত তাহলে এই তালিকাটি আমি আরো দীর্ঘ করে দিতাম!

কাদের মোল্লার পক্ষে বাংলাদেশের বিপক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয়ভাবে যে নিন্দা প্রস্তাবটি নিয়েছে সেটি আমার কাছে এই রাষ্ট্রটির সাথে মানানসই একটি কাজ বলে মনে হয়েছে। এই দেশে তাদের যে অনুচরেরা আছে, তাদের চেহারাটি মনে হয় বেশ ভালোভাবে উন্মোচন করা হয়েছে। আমাদের নূতন প্রজন্ম এর মাঝে ভয়ানকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে—আমি ঠিক এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই আশা করেছিলাম। তারা আমাকে নিরাশ করেনি।

৪.

১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে জাতীয় সংগীত গেয়েছিলাম। সৃষ্টিকর্তা আমার গলায় কোনো সুর দেননি, আমার মাঝে মাঝে সে জন্যে খুব দুঃখ হয়। আমার মনে হয়, যদি আমার গলায় একটু সুর থাকত তাহলে "আমার সোনার বাংলা" গানটি আমি না জানি কত সুন্দর করে গাইতে পারতাম। যত বেসুরো গলাতেই গাই না কেন এই গানের চরণগুলো উচ্চারণ করার সময় প্রতিবার আমার চোখ ভিজে আসে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বেসুরো গলায় আমি যখন গানটি গাইছিলাম তখন একটি একটি করে চরণ গাওয়া হচ্ছিল আর আমার মনে হচ্ছিল, আহা আরো একটি লাইন শেষ হয়ে গেল! আমার মনে হচ্ছিল আহা, যদি অনন্তকাল এই গানটি গাওয়া যেত! যদি কোনো দিন এই গানটি শেষ না হতো!

জাতীয় সংগীত শেষ হওয়ার পর সাবধানে আমি আমার চোখ মুছেছি। আমাদের প্রজন্মের কাছে এটি তো শুধু একটি সংগীত নয়, এটি আমাদের অস্তিত্ব, এটি আমাদের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা। আমাদের আনন্দ, আমাদের উল্লাস।

আমার পাশে কম বয়সী একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, জাতীয় সংগীত শেষ হওয়ার পর আমাকে বলল, "স্যার, জানেন, যতবার আমি আমার সোনার বাংলা গান গাই আমার চোখে পানি চলে আসে!"

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমাদের নূতন প্রজন্ম কেমন করে আমাদের সকল স্বপ্ন, আমাদের সকল ভালোবাসা, সকল মমতাকে এমনভাবে গ্রহণ করতে পারল?

[ডিসেম্বর ২০, ২০১৩-এ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত]

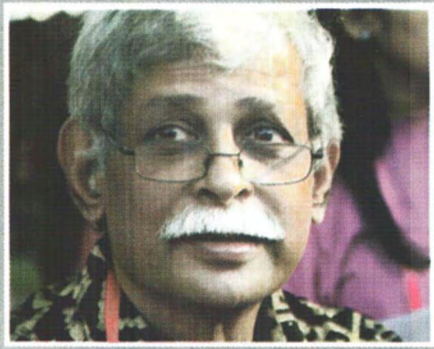

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

আলোকচিত্র ▪ সুব্রত ঘোষ